দুরাশার ডাক

দুরাশার ডাক

শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীসুখেন্দু বিকাশ মজুমদার
পাবলিসিং সিণ্ডিকেট
২৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আশ্বিন ১৩৪৯

এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশব সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
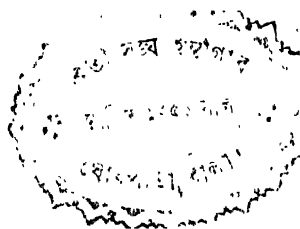
দুরাশার ডাক

এক

পেনিটির গোঁসাই বংশের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। আর পেনিটি যে কল্‌কাতার খুব কাছে, তাও তোমরা জানো। সেই গোঁসাই বংশ আগে ছিল মস্ত বড় জমীদার। তাদের ছিল হাতীশালে হাতী আর ঘোড়াশালে ঘোড়া। বড় বড় সব ধানের মরাই, তার চেয়েও বড় ছিল তাদের খ্যাতি। জমীদারকে সবাই বলতো রাজা, আর সেই রাজার হুকুমে ইয়া-ইয়া পাট্টা সব জোয়ান-জোয়ান পাইক পেয়াদা আর বরকন্দাজ ছুটতো দিকবিদিকে। গোঁসাই বংশের নামে তখনকার দিনে বাঘে আর গরুতে একসঙ্গে জল ত খেতোই, সেটা সামান্য, তাদের নামে নাকি বাঙ্গলা দেশে ভূমিকম্প হোতো!

সে প্রায় দুশো বছর হোলো। কোম্পানীর আমল থেকেই গোঁসাইদের খ্যাতির জৌলস ধুয়ে গেল। দেখতে দেখতে জমীদারী হাতীশালা মিলিয়ে এলো। জমীদার বংশ হয়ে গেল ছত্রখান। সেই বংশের একটা দল পদ্মানদী পেরিয়ে

গেল পূর্ব্ববঙ্গে, একদল গেল সুন্দরবনের দিকে, একদল গেল পশ্চিম দেশে,—আর শেষকালে যে-দলটা শিবরাত্রির সল্‌তের মতন টিম টিম করছিল, তারা পেনিটির প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকার ধ্বংস স্তূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে কল্‌কাতার দিকে এলো। তোমরা যদি কোনদিন পেনিটির দিকে যাও, দেখতে পাবে এণ্টনী সাহেবের বড় দীঘির পারে যে প্রকাণ্ড বাঁশবাগান, তারই উত্তরপারে আজো রয়েছে পুরনো ইমারতের চিহ্ন। দিনের বেলা সেখানে বড় বড় দাঁড়কাক ও সব্‌জিরঙের ঘুঘুপাখীর ভিড়, আর রাত্রের দিকে চ'রে বেড়ায় গোখরো সাপ, আর বনশূয়োর। সেই জনশূন্য ইমারতের জরাজীর্ণ চেহারায় দাঁড়িয়ে রুদ্রের জটারাশির মতন অশ্বত্থগাছের শিকড়-মাকড়, আর তারই রন্ধ্রে রন্ধ্রে দিনরাত ঝিঁঝি পোকা কাঁদে।

সে যাই হোক, বড় গোঁসাইদের ছোট একটা শাখা—যারা কল্‌কাতার কিনারায় এসে উঠেছিল, তাদের বংশে বাতি দেবার মতন কেউ কেউ এখনো বেঁচে রয়েছে। কল্‌কাতার ধারে থাকলেও তারা আজো সভ্যতার আলোয় এসে পৌঁছতে পারেনি, পুরনো শিক্ষা আর সংস্কারের ধারা তারা টেনেই চলেছে। এই বংশেরই সব শেষের সন্তানের নাম হোলো, সমীরকুমার। মাসিমা আদর ক'রে নামটা রেখেছিলেন।

বংশের দুলাল হ'লে বড়ই বিপদ। পুরনো জমীদারের ছেলে, বড় হ'লে সম্পত্তি পাবে। সুতরাং সমীরের আদর

বেশী। ছোট বেলায় মা-বাপ ষষ্ঠি আর শীতলার কাছে ... করেছিল। একটু বড় হ'লে পাঁচুঠাকুরের দোর ... রছিল। তার চেয়ে আর একটু বড় হ'লে তারকনাথের তাগা, ষাড়সাহেবের ব্রত, কালীঘাটে বলি, সত্যনারায়ণের সিন্নি— আরো কত কি। ছেলেটা হোলো ভীষণ আব্‌দেরে। বাপের পিঠে চ'ড়ে 'ঘোড়া ঘোড়া' খেলে, আবদার না মিটলে বিধবা পিসিকে ঠেঙ্গায়, পাড়ার গরীবের ছেলেদের কান মলে দেয়। সমীর একটু যদি কাঁদে অমনি বাড়ীময় হৈ চৈ, যদি তার গায়ে কখনও একটু আঁচড় লাগে, বাড়ীময় কান্নাকাটি প'ড়ে যায়। ...দের একমাত্র সন্তান, তাকে অনাদর করবে, কা'র ঘাড়ে ... মাথা ?

বড়লোকের ছেলে হবার বিপদও কম নয়, তা তোমরা ... জানো। সমীর একটু বড় হ'তে না হ'তেই অমনি কড়া পাহারার ব্যবস্থা। সে ইস্কুলে যাবে, চারজন চাকর তাকে ঠেলাগাড়ীতে নিয়ে চললো। হেঁটে সে স্কুলে যাবে, একি কখনো সম্ভব ? বড়লোকের ছেলে কি হাঁটতে পারে ? ...দের ব'লে দেওয়া আছে, খবরদার, ছেলে যদি পড়ার ... মার খায়, তবে ইস্কুল ছাড়িয়ে নেওয়া হবে। ছেলেদের ...ছ, যদি কেউ সমীরের গায়ে হাত তোলে তবে তাদের ...শে ধরিয়ে দেওয়া হবে। সমীর ফুটবল খেলতে গেল, ...জন গেল তার সঙ্গে সঙ্গে। খেলতে গিয়ে তার পায়ে চোট

লাগলো, অমনি তিনজন ডাক্তার এলো তার
বাড়ীময় কান্নাকাটি, এবং সমীরের আটদিন ইস্কু
ছেলের প্রতি শাসন কারো নেই, কিন্তু চারিদিকে
বন্দোবস্ত। বাড়ীর ঝি, চাকর, ঠাকুর, সরকার,
মাসিমা,—বাড়ীর অন্যান্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সকলেই
গোঁসাই বংশের শেষ বংশধরটির জন্য একেবারে তটস্থ। আড়াল
থেকে বাড়ীর একটি ছোট মেয়ে একদিন সমীরকে ভেংচি
কেটেছিল, সেই অপরাধে সমীরের বাপ মেয়েটাকে একেবারে
আধমরা ক'রে ছেড়ে ছিলেন। এমন যে কুলতিলক সমীর,
সেই সমীর দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলো নাড়ুগোপালের
মতন। বাপ মনে মনে গর্ব্বিত হয়ে বলেন, আহা, আমার ছেলে!
এক টুকরো চাঁদের কণা!

ছেলের নাচন-কোঁদন দেখে মা-বাপ সবাই আহলাদে
আটখানা।

সমীরের বয়স হোলো ষোল বছর। তার হাতে পাঁচটা
আংটি, পঁচিশটে সিল্কের জামা, একান্নখানা শান্তিপুরের ধুতি,
ষাট্টি জোড়া জুতো। তার আলাদা ঘর, তিনটে টেবিল,
সাতটা আলমারি, এগারোখানা চেয়ার। তার জন্যে মেহগনির
পালঙ্ক, সিল্কের লেপ, পশমের বালিশ, রূপার থালা, সোনার
কলম। তার গান-বাজনার আলাদা ঘর, তার লাইব্রেরী, তার
তাসপাশা খেলার মহল। তার মাথার জন্য সুগন্ধী তেল, তার

আতর গোলাপ, তার মন ভোলানোর জন্য ফুলের ...র স্নানের জন্য গাজিপুরের গোলাপ জল। তার আগে বাড়ীর কোনো ছেলেমেয়ে জল স্পর্শ করবে না, -কর্ত্তার এই হুকুম। তাকে পড়াবার জন্য সকালে আর সন্ধ্যায় যখন মাষ্টার আসবে তখন বাড়ীর কেউ গোলমাল করা দূরের কথা, টুঁ শব্দটি করলেই অমনি তার গর্দ্দান যাবে। এর কারণ আর কিছু নয়, সমীর বড়লোকের ছেলে, সে বংশের দুলাল।

গোঁসাই বংশের শেষ বংশধর শ্রীমান সমীরকুমার যখন এইভাবে পরিবারের মানসম্ভ্রম, মর্য্যাদা, ভদ্রতা ও সৎশিক্ষা এবং সুরুচির মাথার ওপর পা দিয়ে মানুষ হয়ে উঠছিলেন, সেই সময় এবাড়ীর মাসিমার ননদের এক দেবর এসে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন। লোকটির বয়স অনেক, প্রায় চল্লিশ, কিন্তু তাঁর চেহারা যেন বিরাট এক দৈত্যের মতো। গলাটা এত কর্কশ আর মোটা যে, গলার আওয়াজ শুনলে ভয় করে। তিনি এসে বাহির বাড়ীর একটা ঘরে আশ্রয় নিলেন। তাঁর পরণে হাফ-প্যাণ্ট আর হান্টিং কোট, কোমরে ঝোলানো একখানা বড় ছুরী। তাঁর চেহারা দেখলে ভয় করে। তাঁর গালে, কপা[illegible] ঘাড়ে, হাতের কব্জিতে কতক[illegible] আঘাতের চিহ্ন। চোখ দুটো তীব্র, ঠোঁট দুখানা পুরু আর [illegible]। তাঁকে বাহিরের ঘরে উঁকি মেরে দেখে ছোট ছেলেমেয়েরা ভয় পেয়ে পালিয়ে এল,

এবং তার সঙ্গে সঙ্গে খবর র'টে গেল, সাবধান,
ধরে নিয়ে যাবে। ক্রমে ক্রমে কানাকানিতে খবর,
লোকটার নাম মেজর সিং।

মেজর সিংয়ের আগে নাম ছিল অবশ্য ধনঞ্জয়
কেমন ক'রে তাঁর নাম হোলো মেজর সিং, সে অনেক কথা।
তবে তাঁর পরিচয়টা মোটামুটি এখানে ব'লে রাখি।

অনেক দিন আগে যখন ইংরেজ আর জার্ম্মাণীর মধ্যে
যুদ্ধ বাধে, সেই সময় বাঙ্গালী পল্টনের ভিতর [illegible] চেয়ে
অল্পবয়সী সে-ছেলেটি মেসোপোতেমিয়ার যুদ্ধে গিয়েছিল, তারই
নাম ছিল ধনঞ্জয় রায়। যুদ্ধ থেকে সে যখন স্বদেশে ফিরে
এলো তখন সবাই তাকে মেজর সিং ব'লে জানলো। সুস্থ
দেহেই সে ফিরেছিল বটে, তবে প্যালেস্টাইনের কোন্ এক
জঙ্গলের পথে সে যখন সরকারী তহবিল নিয়ে পেরিয়ে চলেছিল,
সেই সময় দুজন আরব দস্যুর সঙ্গে তার লড়াই বাধে। সে
অনেক ব্যাপার। তাঁর গায়ের ওপর [illegible] ডাকাতের ছোরার
দাগ আছে। কিন্তু তাঁর নাম কেন হোলো মেজর সিং, সেটা
[illegible]শ্য সামান্য ঘটনা। বাগদাদের [illegible]কাছি কোনো এক মাঠে
[illegible]র একবার তাঁবু ফেলা [illegible] হঠাৎ একদিন রাত্রে দুটো
[illegible] না 'বাইসন' তাঁদের তাঁবু [illegible]মণ করে। অন্ধকারে বন্দুক
নিয়ে প্রস্তুত হবার আগেই [illegible] জানোয়ার দুটো ভীষণ হিংস্রতার
সঙ্গে তাদের ওপর [illegible] পড়ে। ধনঞ্জয় প্রাণ বিপন্ন ক'রে

এগিয়ে গিয়ে ওদের মধ্যে একটি জানোয়ারের শিং দুটো বাগিয়ে ধরে। দ্বিতীয় জানোয়ারটি বন্দুকের গুলীতে অবশ্য মারা পড়ে, কিন্তু প্রথমটির সঙ্গে ধনঞ্জয়ের অদ্ভুত লড়াই দেখে সবাই স্তম্ভিত। ধনঞ্জয় লড়াই করে সেই বুনো জানোয়ারকে কাৎ করে, তারপর তাকেও গুলী ক'রে মারা হয়। এখন তোমরা বুঝতেই পাচ্ছ, ধনঞ্জয় বাইসনের সিং ধ'রে যুদ্ধ করেছিল, তাই তখন থেকে তার নাম হয়ে গেল মেজর সিং।

মেজর সিং কল্‌কাতায় এসেছিলেন সরকারী কাজে। মধ্য ভারতের কোন্ এক সরকারী জঙ্গলের তিনি রেন্‌জার এবং পুলিশের কাজেও তিনি লিপ্ত। তিনি সেখানেই থাকেন, তবে মাঝে মাঝে আয়ব্যয়ের ব্যাপারে তাঁকে কখনো দিল্লী আর কখনো বা কলকাতায় আনাগোনা করতে হয়। মাত্র দিন তিনেক তিনি এখানে থাকবেন। একটু একটু ক'রে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারলো মেজর সিং ডাকাতও নয়, দৈত্যও নয়,—তিনিও মানুষ। তারপর যখন তারা জানলো, কেবল মানুষও নয়, ভালো মানুষও বটে, তখন তারা এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে এল। মেজর সিং খুশী হয়ে হাসিমুখে তাদের খাবার আর খেলনা কিনে এনে দিলেন।

সমীর কিন্তু সবটাই লক্ষ্য করছিল নীরবে। এবার সে এগিয়ে এসে নিজেই আলাপ করলো। প্রথম থেকেই মেজর সিংয়ের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছিল। তারপর মাসিমার কাছ

থেকে চুপি চুপি সে যখন মেজর সিংয়ের কাহিনী সংগ্রহ করতে পারলো, তখন সে মুগ্ধ হয়ে গেল। সাহসী পুরুষ সে কখনো দেখেনি। বিশেষ ক'রে মেজরের শরীরে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন দেখে তার মনে হোলো, অসংখ্য ইতিহাসও ওই দাগগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

সে ধ'রে বসলো, আপনার কাছে গল্প শুনতে চাই, মেজর সিং।

গল্প? হা-হা হা-হা,—মেজর সিং উচ্চকণ্ঠে এমন হাসি হেসে উঠলেন, যেন ঘরখানাই কেঁপে উঠলো। বললেন, ছেলেদের বই খুললে ত অনেক বীরত্বের গল্প শুনতে পাবে? আমি কি গল্প বলতে জানি? গল্প শুনলে কি বীরপুরুষ হওয়া যায়?

সমীর তখনকার মতো লজ্জিত হয়ে চ'লে গেল বটে, কিন্তু মেজর সিংয়ের মুখখানা যেন সর্ব্বদা তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে লাগলো। এমন একটা অশান্তি তার মনে কখনো আসেনি; অদ্ভুত একটা আকর্ষণ তাকে যেন বারম্বার চুম্বক শক্তির মতো বাইরের ওই ঘরখানার দিকে টানছে। নিজের মনের কথা বাড়ীর কাউকে সে কিছুতেই জানতে দিলনা, কিন্তু লেখাপড়ায়, খাওয়া দাওয়ায়, আরামে-স্বাচ্ছন্দ্যে হঠাৎ একটি দিনের মধ্যেই তার যেন সব রুচি চ'লে গেল। রাত্রে তার ঘুম হোলো না, চুপি চুপি উঠে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলো। সুদূর মেসোপোতেমিয়া, অজানা বাগদাদ আর অরণ্য, মরুভূমির

ভিতর দিয়ে বেদুইন দস্যুদের আনাগোনা—পৃথিবী যেন আজ রাত্রে সমীরের চোখে বিশাল ও রহস্যময় মনে হোলো। দুর্গম দেশ, গহন অরণ্য, অনন্ত সমুদ্র, গগনস্পর্শী পর্ব্বত—এরা যেন বারান্দার চারিদিক থেকে হাতছানি দিয়ে সমীরকে ডাকতে লাগলো। কিছুতেই সে-রাত্রে তার চোখে ঘুম আসতে চাইলো না।

পরদিন সে আবার মেজর সিংয়ের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মেজর সিং তখন কতকগুলি কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছিলেন। সমীরকে বললেন, এই যে, আবার এসে হাজির। কি গল্প তোমাকে বলি বলো ত ? তাছাড়া গল্প শোনে মেয়েমানুষ, পুরুষরা গল্প তৈরি করে।

সমীব বললে, আপনি ত কালই চ'লে যাবেন। যদি দু'চারদিন আরো থাকতেন—

মেজর সিং বললেন, বিশেষ কাজে এসেছি কিনা, নৈলে বাবা, তোমাদের অনেক গল্প শোনাতে পারতুম।

সমীর বললে, আপনার কানের কাছে ওটা কিসের দাগ বলুন ত ?

কানের কাছে ? ওঃ, ওটা হোলো চিতাবাঘের থাবার চিহ্ন। বছর কয়েক আগে বিহারের জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলুম, সেই সময় একটা চিতাবাঘ আমাকে একটু আদর করেছিল

আর কি। বেটারা ভারি অসভ্য, পালাবার সময় সুবিধে পেলে শিকারীকে দু'একটা চড়-চাপড় বসিয়ে দিয়ে যায়।

কথাটা বললেন তিনি হাসিমুখে, কিন্তু সেই কথা শুনে উত্তেজনায় সমীরের সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো। লাজুক মুখ তুলে সে আবার জিজ্ঞাসা করলো, আপনি এবার কোন দিকে যাবেন ?

আমি ?—মেজর সিং মুখ তু'লে বললেন, এবার যাবো নিজের ডেরায়, সেই মধ্যভারতের জঙ্গলে। তুমি কাল থেকে এসব জানতে চাইছ, কেন বলো ত

আমি জঙ্গল কখনো দেখিনি !

বেশ ত' বড় হ'লে দেখো।—এই ব'লে মেজর সিং তাঁ'র কাগজপত্রে আবার মনোনিবেশ করলেন।

সমীর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে মেজর সিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে এক সময় চ'লে গেল।

পরদিন সকলের কাছে বিদায় নিয়ে মেজর সিং বিদায় নিলেন। তাঁর যাবার সময় সমীর একবার এসে একপাশে দাঁড়ালো। তার মনের মধ্যে ওই লোকটা কি দুরন্ত সমুদ্রের আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল, তা কেউ জানতে পারলো না।

একথা ঠিক, সমীরের একঘেয়ে জীবনের মধ্যে দিন তিনেকের জন্য একটুখানি বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছিল, কিন্তু তারপরেই আবার যেমন তেমনি। সেই পুরনো আদর, তার চারিদিকে সেই বড় মানুষী চাল, তার জন্য বাড়ীসুদ্ধ লোকের

অদ্ভুত সতর্কতা, সেই দিদিমা-মাসিমা-ঠাকুমাদলের যন্ত্রণাদায়ক স্নেহ। রাক্ষসপুরীর মধ্যে রাজপুত্র যেমন প্রচুর বিলাস আর আনন্দের উপকরণ পেলেও সে চিরবন্দী থাকতে বাধ্য,—সমীরের ঠিক সেই অবস্থা। সে যা চায় তাই পাবে, তার অভাব অভিযোগ কোথাও কিছু নেই, যত্ন আর সমাদরের বন্যায় সে চিরকাল গা ভাসিয়ে চলতে পারবে,—কিন্তু তার মুক্তি তার স্বাধীনতা কোথায় ?

হঠাৎ তিন দিনের মধ্যে তার মনে যেন বিষক্রিয়া সুরু হোলো। এসব তার আর কিছু ভালো লাগচেনা, তার মুক্তি চাই। বিলাসের এই চক্রান্ত, স্নেহমমতার এই ষড়যন্ত্র থেকে তার বিদায় নেওয়া চাই। বাইরে অবাধ অগাধ মুক্তি, সেখানে স্বচ্ছ স্বাধীনতার কলরোল,—পৃথিবী তাকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে। এই শিকল ছিঁড়ে, আরাম আর ঐশ্বর্য্যের এই ভয়ানক দাসত্ব থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে যেতে হবে বিশ্বজগতের পথে। সমীর ঠিক করলো, সে পালাবে। অন্ধকার রাত্রে চুপি চুপি কারুকে না জানিয়ে অজানা পথে সে পালাবে। কোথায় যাবে সে জানেনা, কোথায় গিয়ে সে আশ্রয় পাবে তার ঠিক নেই। পথে কত বিপদ, কত ভয়, কত দুর্য্যোগ, কত দুঃখ,—কিন্তু এই অনড়, অন্ধ, এই পরাধীন জীবনের চেয়ে সেই ভালো। সে নিশ্চয় পালাবে।

মেজর সিংয়ের ঘরে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ তার

চোখে পড়লো এক টুকরো কাগজ। সেটি তুলে নিয়ে দেখলো, সরকারী একখানা চিঠির খামের অংশ। উপরে মেজর সিংয়ের নাম, তার নীচে মধ্যভারতের কোন্ একটা জঙ্গলের এক ডাকঘরের নাম। কাগজের টুকরোটা পেয়ে সমীরের চোখ দুটো যেন আশায় আর আনন্দে জ্বলে উঠলো। জামার পকেটে সেটা লুকিয়ে রেখে সে ভিতর মহলে চ'লে গেল।
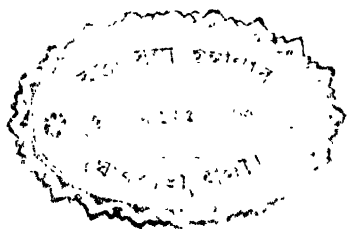
গোঁসাই বংশে এত বড় ঘটনা আর কোনোকালে ঘটেনি।

ভোর-রাত্রের দিকেই বাড়ীময় কেমন একটা সন্দেহ দেখা গেল। ঝি-চাকর উঠে দেখলো সদর দরজা খোলা। প্রথমটা অনেকে মনে করেছিল বাড়ীতে চুরি হয়েছে। কিন্তু চুরির কোনো চিহ্ন চোখে পড়লো না। দেখতে দেখতে হঠাৎ মাসিমা উঠলেন চেঁচিয়ে, হলধর গোঁসাই ছুটে এলেন সমীরের ঘরে, ঠাকুমা কাঁদতে কাঁদতে নামলেন নীচে, মামা গেলেন রাস্তায় দৌড়ে, কাকা ছুটলেন বাড়ীর আনাচে কানাচে খুঁজতে,—এবং তারপরেই বাড়ীময় পাড়াময় একটা হৈ চৈ উঠলো। সমীরকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ষোল বছরের ছেলে কোনোদিন রাস্তায় বেরোয় নি। কল্‌কাতা শহরের সে কিছুই জানে না। সে যে নিজের থেকে কোথাও চলে যাবে, বাড়ীর কর্ত্তা একথা বিশ্বাস করলেন না। পাড়ার লোক ভোরবেলা বেরিয়ে চারিদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। অনেকেরই ধারণা, অমন সুশীল ও সুবোধ বালককে নিশ্চয় কেউ চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছে। সত্য ঘটনাটা

কারো জানবার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং সকলেই এক-প্রকার স্থির করলো, কোনো দুষ্ট ব্যক্তি ছেলেটাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে টাকা আদায় করবার লোভে।

সকালবেলা কর্ত্তা পুলিশে খবর দিলেন, এবং দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন লিখে পাঠালেন। মামা ও কাকা লোক মোতায়েন করলেন ; তারা ছুটলো দিকে দিকে সমীরের সন্ধানে। খবরের কাগজে ছেলে চুরি হওয়ার ব্যাপারটা ফলাও হয়ে তার পরদিন বেরিয়ে গেল। পুলিশের দল এসে সাড়ম্বরে তদন্ত করতে লাগলো।

সমস্ত পরিবারে কান্নার রোল উঠেছে। সমীরের মৃত্যু ঘটলে একটা সান্ত্বনা থাকতো, কিন্তু এ-ঘটনা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। হঠাৎ একরাত্রে সুস্থ শরীরে একটি বলিষ্ঠ বালক নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, এই মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ সহ্য করার মতো মনের জোর কারো ছিল না। যাবার সময় কিছুই সে নিয়ে যায় নি। কেবল পরণের ধুতি, শার্ট-কোট, পায়ে জুতো। সকলেই জানে, সমীরের সঙ্গে একটি কাণা কড়িও নেই। কর্ত্তা একবার সন্দেহের সঙ্গে ভাবলেন, সমীরকে যদি চোরে চুরি করেই নিয়ে যাবে তবে এত কাপড়-চোপড় পরবার সময় কোথায় ছিল ? পুলিশের দারোগা বললেন, এটা চুরি নয়, ছেলে আপনার নিজের ইচ্ছাতেই পালিয়েছে মনে হচ্ছে।

কিন্তু যে ভাবেই নিরুদ্দেশ হোক, সমীর এ বাড়ীতে আর

নেই, এইটিই যথেষ্ট। সে মরেনি, কিন্তু কোনো কালে আর তাকে দেখতে পাবে না। বাস্তবিক, ছেলে যাদের হারিয়েছে তারাই জানে, এ ঘটনা মৃত্যুর অপেক্ষাও শাস্তিদায়ক।

আগুন যেমন প্রথমটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে পরে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে, তেমনি এই পরিবারের শোক তাপ জ্বলতে লাগলো। মা, বাবা, মাসিমা, ঠাকুমা, কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে শোকার্ত্ত হৃদয় নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলেন। সব জায়গায় লোক পাঠানো হয়েছে, সংবাদ দেওয়া হয়েছে,—কিন্তু শুভ সংবাদ কোথাও থেকে এলো না। বংশের একমাত্র ছেলে সে—তার ভাই বোন আর নেই, সুতরাং মা বাবারও আর কোনো সান্ত্বনা রইলো না। পাড়ার লোক কেউ কেউ কানাঘুষো ক'রে বলতে লাগলো, হবে না? ছোট ছেলেকে অমন ক'রে বাড়ীর মধ্যে আঁচলে বেঁধে রাখলে সে কি থাকে? আর একজন বললে, নিজের ছেলের অহঙ্কারে পাড়ার সব ছেলেকে ওরা তুচ্ছ জ্ঞান করতো, স্বার্থপরতার শাস্তি আছে ত।

পাড়ার লোকের মন্তব্য শুনে বাড়ীর সকলে স্তব্ধ বেদনায় চুপ ক'রে রইলো।

এবার আমরা সমীরের পিছু পিছু যাবো। ভোর রাত্রে সে যখন মা বাবা, মাসিমা ঠাকুমার মায়া কাটিয়ে চুপি চুপি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো, তখন তার মনের একদিকে ছিল যেমন সাহস, অন্য দিকে তেমনি ভয়। তার ভীরু পা বেপরোয়া হয়ে

এক দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। গাড়ী চ'ড়েই সে চিরকাল বেড়িয়েছে, কিন্তু পায়ে হেঁটে কোথাও এতদূর যাওয়া এই তার প্রথম। ভোর রাত্রির আকাশ তার চোখে অদ্ভুত লাগলো। সূর্য্যের আলো তখনও দিগন্তের সীমায় এসে পৌঁছয়নি, কিন্তু ভোরের হাওয়ায় আকাশের বড় বড় তারাগুলি তখন দপ দপ ক'রে জ্বলছে। কলকাতায় শেষ রাত্রির চেহারা বড় বিচিত্র। সবেমাত্র পথের আলো নিবতে আরম্ভ করেছে, ঝাড়ুদারের শব্দ, জঞ্জালের গাড়ী—এ ছাড়া আর কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। সমীর ভয়ে ভয়ে এগিয়ে চললো। জীবনে সে ভাল ক'রে দুই পা ছড়িয়ে কোনোদিন হাঁটেনি,—আজ তাই ভয়ের মধ্যেও তার মনে হ'তে লাগলো; কী আশ্চর্য্য অবাধ মুক্তি! মেজর সিংকে যেদিন সে খুঁজে বার করবে, সেদিন সে বলবে, আপনার কাছে আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ, আপনি আমার চোখের সামনে না এলে আমি কোনোদিন মুক্তি পেতাম না।

দেখতে দেখতে সকাল হলো। রোদ উঠলো চারিদিকে। পথে ঘাটে সকালের আলো এসে নামলো। সমীর হেঁটে চললো দ্রুতপদে। কোন্ দিকে অথবা কোন্ পথে সে চলেছে, তার জানা নেই। এতক্ষণে বাড়ীর লোক জানতে পেরেছে, এতক্ষণে তার চারিদিকে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। ঠাকুমার দুটি ব্যাকুল চোখের কথা তার মনে পড়লো, মাসিমা ও মায়ের উৎকণ্ঠ দৃষ্টি যেন তার পিছু পিছু ছুটে আসতে লাগলো। কিন্তু সমীর পিছন

দিকে তার তাকালো না। আজ সে হাঁটতে পেরেছে সহজ আনন্দে, আজ তার সঙ্গে এই পৃথিবীর দেখাশোনা চলেছে যেন ঠিক পুরনো বন্ধুর মতো। রাস্তায় রাস্তায় কত বিচিত্র শোভা, কত দোকানদানি, কত লোকজন, কত গাড়ীঘোড়া। একটা কয়েদী যেন অনেক দিন জেল খেটে এবার পালিয়ে চলেছে।

হঠাৎ সমীরের মনে প'ড়ে গেল, মেজর সিংকে পাওয়া যাবে কেমন ক'রে? কি ভাবে সে সেই দূরদেশে যাবে? রেল-গাড়ীতে যেতে হবে বটে, কিন্তু যাবার পথ কিছুই ত সে জানে না? তাছাড়া তার কাছে টাকা-পয়সা কই? তার খাবার সংস্থান নেই, আশ্রয় নেই, চেনা পরিচয় নেই,—কি ভাবে সে চলবে? এই যে সে চলেছে পথে বিপথে, এই পথ তার কোথায় গিয়ে শেষ হবে? অন্যদিন এমন সময় সকালবেলা মাসিমা তাকে বসিয়ে খাওয়ান,—আজ তার খাবার ত কোথাও কিছু নেই। মুক্তির চেহারা দেখে পৃথিবীকে তার সুন্দর মনে হয়েছিল কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্রে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হচ্ছে; পৃথিবী নিষ্ঠুর। তার ক্ষুধার আহার আর পিপাসার জল দেবার মানুষ কোথাও নেই। সমীরের বুকের ভিতরটা ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

উত্তর কলিকাতা ছাড়িয়ে চওড়া রাস্তা ধ'রে সে চললো। সেদিকটা বস্তি অঞ্চল, কল-কারখানা, কুলি-মজুরদের ভিড়। বহুদূর অবধি এসে একটা গাছের ছায়ায় নিরিবিলি পথের ধারে

বিশ্রাম নেবার জন্য সে ব'সে পড়লো। এতদূর পথ সে আর কোনোদিন পায়ে হাঁটেনি। বেলা কত বেড়ে গেছে তার কোনো ঠিকানা নেই, তবে সূর্য্য প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে। সমীরের গলাটা শুকিয়ে উঠেছিল।

একদল জেলে সেই পথ দিয়ে সোরগোল করতে করতে চলেছে। তারা কোথায় যেন গিয়েছিল যাত্রা শুনতে, তারপর সকালবেলাটা ঘুমিয়ে এবার মধ্যাহ্নের দিকে তাদের বাসার পথে চলেছে। তাদের মধ্যে হঠাৎ একজন ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, বাবু, এখানে বসে তুমি কাঁদছ কেন ?

চোখ বেয়ে সমীরের জল পড়ছে. এতক্ষণ সে বুঝতে পারেনি। জামার হাতায় চোখ মুছে সে বললে, না, এমনি। আচ্ছা, এ রাস্তাটা কোনদিকে গেছে তোমরা বলতে পারো ?

এ রাস্তা গেছে তাঁতিপাড়ার দিকে। তোমার বাড়ী কোথায়, বাবু ?

পাছে সে ধরা পড়ে যায়, এই ভয় সমীরের ছিল। সে বললে, বাড়ী আমার কলকাতাতেই,—আচ্ছা, তোমরা বলতে পারো হাবড়া ষ্টেশন কোন দিকে ?

একজন বললে, হাবড়া ষ্টেশন ? সে অনেক দূর, এখান থেকে চার ক্রোশ। দক্ষিণ পশ্চিমের পথ ধ'রে যেতে হবে।

আর একজন বললে, বাবু, তোমাকে বড়লোকের ছেলে মনে হচ্ছে। পথ হারিয়ে গেছ বুঝি ?

সমীর বললে, না। আমি এবার হাবড়ায় যাবো।

তোমার কিন্তু মুখ শুকিয়ে গেছে, বাবু। আমাদের সঙ্গে কলা আর আখের গুড় আছে, তুমি খাবে ?

দ্বিতীয় লোকটা বললে, তুমি কি ব্রাহ্মণের ছেলে ?

হ্যাঁ।—ব'লে সমীর চুপ ক'রে রইলো। সে লোকটা তার ঝুড়ি থেকে চারটে মর্ত্তমান কলা আর কলাপাতায় খানিকটা আখের গুড় দিয়ে বললে, আজ দশহরার দিন, ব্রাহ্মণের সেবা হোক, বাবু।

ভাগ্যের কেমন একটা চক্রান্ত। এমন অনায়াসে সে আহার পাবে একথা সমীর কল্পনাও করেনি। তিন চার জন লোক মিলে তাকে খাইয়ে খুশী ক'রে এক সময় বিদায় নিল। এতক্ষণ পরে সমীরের যেন অনেকটা নতুন উৎসাহ দেখা দিল।

আধ ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেবার পর তার সাহস যেন অনেকটা বেড়ে গেল। সে বুঝতে পারলো, ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলে কে একজন যেন চালিয়ে নিয়ে যায়। অদৃষ্টে কোনো শক্তি থাকে সঙ্গে সঙ্গে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় সে ক্লান্ত হয়েছিল, এখন সে শক্তি সঞ্চয় করেছে। সমীর উঠে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলো।

তিন

উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যার কাছাকাছি সমীর হাবড়া ষ্টেশনে এসে পোঁছলো। কত গাড়ীঘোড়া, কত মানুষের কলরোল। ইঞ্জিনের শব্দ আর বাঁশীর আওয়াজ মিলে তার চোখের সামনে যেন একটা নতুন জীবনের আস্বাদ। ছোটবেলায় তারা সবাই মিলে গিয়েছিলো একবার তারকেশ্বরে, স্বপ্নের মতো সেই কথা মনে পড়ে। জীবনে সেই তার প্রথম ও শেষ রেলগাড়ী চড়া। তারপর থেকে ঘুমের ঘোরে সে কতদিন কল্পনা করেছে, সে রেলগাড়ী চ'ড়ে চলেছে দূর থেকে দূরান্তরে, গ্রামের পরে মাঠ পেরিয়ে, বনের পরে পাহাড় পেরিয়ে। তার কোথাও বিশ্রাম নেই, তার কোথাও বাধা নেই,—নতুন নতুন দেশ আর নতুন নতুন মানুষ আবিষ্কার করতে করতে সে চলেছে নিরুদ্দেশ কোনো এক জগতে। ছেলেদের বইতে সে পড়েছে, আফ্রিকার অরণ্যের কথা, গৌরীশৃঙ্গ অভিযানের গল্প, দক্ষিণ মেরু সাগরের অদ্ভুত কাহিনী। তার মনে পড়ে ইয়ারখন্দের মরুভূমিতে হেডিন সাহেবের রোমাঞ্চ-কর কাহিনী, তার মনে পড়ে সমুদ্রে পথহারা ক্যাপ্টেন বেয়ার্ডের আশ্চর্য্য দুঃসাহস। ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থেকে সে কত বিচিত্র

অভিযান কাহিনী পড়েছে, কত দুর্গমের কল্পনা সে করেছে,—বাড়ীর লোকে কেউ তা টের পায়নি। কত বীর, কত যোদ্ধা, কত দুঃসাহসী, কত ভ্রমণকারী তার ঘরের মধ্যে ঢুকে তার কানে কানে কত রহস্যকথা শুনিয়েছে, বাড়ীর লোকে কেউ সে খবর রাখেনি। আজ পায়ের শিকলটা সে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এলো, শিকলের শব্দটা মা আর মাসিমার মনে অনেকদিন ধ'রে বাজবে বটে,—কিন্তু স্নেহের বন্ধনের চেয়ে মুক্তির দরকার অনেক বেশী। আজ সে নিজেই নিজের অভিভাবক। সে একা বলেই সে সাহসী।

সমীর কোথায় যাবে অথবা কোন্ ট্রেন ধরবে, এই কথা সে ভাবছিল,—কিন্তু পিছন থেকে ভীড়ের ধাক্কায় সে ঠেলা খেতে খেতে কোথায় এসে থামলো তার ঠিক পেলোনা। শোনা গেল, শনিবারের ভীড় এই রকমই হয়। কিন্তু সে টিকিট কেনেনি, সঙ্গে তার পয়সা কড়ি নেই,—সে যাবে কোন্ দিকে? এমন সময় ট্রেনের বাঁশী বাজলো, গার্ডসাহেব সবুজ ফ্ল্যাগ ওড়াতে লাগলেন। প্ল্যাটফরমে স্তব্ধ হয়ে সমীর দাঁড়িয়ে রইলো অনেকটা যেন দিশেহারার মতো। এখন তার কি করা উচিত? সে যখন ষ্টেশনে এসেছে তখন ত তাকে যেতেই হবে। মেজর সিংয়ের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করা, গাড়ীর খবর নেওয়া, টিকেট ঘরের খোঁজ রাখা,—এ সব করতে গেলে হয়ত এখুনি পুলিশে ধরা পড়তে পারে। সঙ্গে তার একটিও পয়সা নেই দেখে লোকে তাকে

প্ল্যাটফরম থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। সমীর নিরুপায় হয়ে চারিদিকে একবার তাকালো।

সহসা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনখানা ছাড়লো। আর সময় নেই, এক সেকেণ্ডও দেরী করা চলবে না। গাড়ীর গতি প্রতি পলকে দ্রুততর হচ্ছে,—নিরুপায় দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাও এখন অসম্ভব। সমীর হঠাৎ ছুটতে ছুটতে গিয়ে লাফিয়ে গাড়ীর হাতল ধ'রে ফেললো। তার ডান পা পিছলে আর একটু হলেই সে প'ড়ে গিয়েছিল আর কি—এ সব অভ্যাস তার কোনোদিনই নেই,—যাই হোক, খুব বেঁচে গিয়েছে সে। গাড়ীর হাতলটা শক্ত ক'রে ধ'রে সে দরজা খুলে একখানা কামরার ভিতরে ঢুকলো।

তার এই দুঃসাহস দেখে গাড়ীর ভিতরে কয়েকজন হিন্দুস্থানী আর বাঙ্গালী মিলে চেঁচামেচি ক'রে উঠলো। প'ড়ে গেলে সে নাকি আর বাঁচতো না। সমীর তাদের কথা গ্রাহ্যই করলো না।

একজন প্রশ্ন করলো, কতদূর যাবে তুমি ?

সমীর বললে, যাবো অনেক দূরে।

আর একজন প্রশ্ন করলো, টিকিট করতে পারোনি বুঝি ?

সমীর তার উত্তরে বললে, তুমি কি টিকিট চেকার ?

লোকটি ধমক খেয়ে চুপ ক'রে গেল। সমীরের স্বাস্থ্য

ভাল, মুখ চোখের চেহারা দৃঢ়, শরীরটা শক্ত। তার দিকে চেয়ে একটি লোক বললে, এসো ভাই, এখানে জায়গা আছে।

জায়গা পেয়ে সমীর গিয়ে ব'সে পড়লো।

কিন্তু গাড়ীতে যদি বা সে উঠতে পারলো, কোথায় যে যাবে তার কোনো ঠিকানা নেই। বিনা টিকিটের সে যাত্রী, কখন সে ধরা পড়বে কে জানে। চলন্ত গাড়ীর মধ্যে ব'সে ব'সে সে নানা প্রকার দুশ্চিন্তা করতে লাগলো। সন্ধ্যার পর গাড়ী ছেড়েছে, হয়ত এখন রাত আটটা কি ন'টা। কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের পর চলন্ত গাড়ীর বাতাস লেগে তার ভারি আরাম বোধ হ'তে লাগলো। সমস্ত দিনের ছোটখাটো ঘটনায় সে বুঝতে পেরেছে, সে যদি সত্যভাষী হয়, মিথ্যা কথা না বলে, তবে তার পক্ষে দুঃসাহসিক অভিযান করা কঠিন হবে। বিনা টিকিটে সে গাড়ীতে চড়েছে, কেউ টের পেলে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে—তারপর দেখতে দেখতে সেই খবর তার বাবার কানে গিয়ে উঠবে। বাড়ীর লোক তাকে আবার ধ'রে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে সে বরং নিজের পথই পরিষ্কার করবে। যেমন করেই হোক, তার এই নিরুদ্দেশ যাত্রাকে সার্থক ক'রে তোলা চাই।

ভাবতে ভাবতে কখন সে জানলার ধারে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে, কতক্ষণ সে এই দোলায়মান গাড়ীর মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে—কিছুই সে বুঝতে পারেনি। হঠাৎ এক সময় কা'র হাতের ঝাঁকুনিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখলো, বিদেশের

কোন্ একটা অজানা ষ্টেশনে এসে গাড়ী থেমেছে। রাত্রি সাঁ সাঁ করছে। গাড়ীর ভিতরে অনেকেই নিদ্রিত। তারপরেই ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে দেখলো, যমদূতের মতো একটা সাহেবী পোষাকপরা লোক হাত বাড়িয়ে তাকে বলছে, টিকিট ?

টিকিট !—সমীরের মুখের উপর থেকে ঘুমের জড়তা কেটে গেল। ঢোক গিলে সে বললে, পাশের গাড়ীতে আমার দাদা আছেন, তাঁর কাছেই টিকিট রয়েছে।

তুমি তবে এ গাড়ীতে কেন ?

আমি ? আমি জল খেতে নেমেছিলুম, তখন গাড়ী ছেড়ে দিলে। ছুটতে ছুটতে এই কামরায় উঠেছি।

টিকিট চেকার মুখভঙ্গী ক'রে বললে, সে হবেনা, তুমি নিজের গাড়ীতে ফিরে যাও। এখুনি যাও, ওঠো। আমি গিয়ে টিকিট চেক্ করবো।

সমীর গাড়ী থেকে নেমে যেতে বাধ্য হোলো। কিন্তু টিকিট-চেকার নেমে গিয়ে যখন অন্য গাড়ীতে উঠলো, তখন সমীরকে আর দেখা গেল না। ওদিকে বাঁশী বাজিয়ে পিছন থেকে গার্ড সাহেব সবুজ আলো ওপর দিকে তুলে নাড়তে লাগলেন। দেখতে দেখতে গাড়ী ছেড়ে দিল। সেই অন্ধকার রাত, আর বিদেশ বিভূঁই—জনমানব কেউ কোথাও নেই,—সেইখানে নেমে সমীর গা ঢাকা দিয়ে একদিকে হাঁটতে লাগলো !

কিন্তু ষ্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালেও বেশী দূর

যেতে তার ভরসা হোলো না। অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখা গেল, কাছেই একটা হিন্দুস্থানী বস্তী,—কিন্তু তার পরে রেলপথের বাঁকের পাশ দিয়ে রাত্রির ধূসর প্রান্তর আকাশের দিগন্ত পেরিয়ে চ'লে গেছে। সাঁ সাঁ করছে রাত ; উপরে অগণ্য জ্বলজ্বলে তারা কয়েক পা গিয়ে সমীরকে আবার ফিরে আসতে হোলো।

তার মনে ভয় ছিল—না আছে টিকিট, না আছে সঙ্গে টাকা পয়সা। যদি সন্দেহ ক্রমে কেউ এসে তাকে ধরে, তবে লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। কিন্তু এই রাত তাকে কোথাও কাটাতেই হবে, আশ্রয় একটা কিছু পাওয়াই চাই।

ভয়ে ভয়ে সে আবার প্ল্যাটফরমের পিছন দিকে এসে উঠলো। পাশেই একটা ঘরের দরজা খোলা রয়েছে। উঁকি মেরে সে দেখলো, ভিতরে কিছু দেখা যায় না। পা টিপে টিপে ভিতরে এসে একপাশে কুন্ঠিত হয়ে শুয়ে পড়লো। সে ঠিক করলো, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে সে এখান থেকে সরে পড়বে। কিন্তু শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হোলো, এ ঘরে সে একা নয়—আশপাশে নানা প্রকার ছড়ানো কি যেন জিনিসপত্রের মাঝখানে মানুষের নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সমীরের একটু সাহস হোলো। যা হোক, সে নিতান্ত একা নয়, মানুষের সমাগম টের পাওয়া যাচ্ছে। কাল ভোরে অবশ্য ওদের জাগবার আগেই উঠে গা ঢাকা দিতে হবে।

কিন্তু সারা দিনরাতের ক্লেশ-ক্লান্তির ভিতরে তার মন হয়ত

মাসিমার স্নেহ যত্নের স্মৃতি নিয়ে একটু নিশ্বাস ফেলে থাকবে; ঘুমের ঘোরে সমীর পাখা মেলে উড়ে গেল সেইখানে, যেখানকার সুখশয্যা আর প্রচুর আরামে তার সমস্ত বাল্যকাল কেটেছিল। গভীর অগাধ ঘুমে সে আচ্ছন্নের মতো ডুবে গেল।

ঘুমের ঘোরেই এক সময়ে সে যেন তার শরীরের কোন্ একখানে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব ক'রে বিকৃতকাতর মুখে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো। গতরাত্রির ইতিহাস তার আর স্মরণ নেই—কোথা থেকে কোন্ যুগে সে যেন উল্কার মতো ছিটকে এসে পড়েছে অজানা কোন্ দেশের এক অপরিচিত কক্ষে। সহসা পায়ের যন্ত্রণা তার তন্দ্রার নেশা ছুটিয়ে দিল।

ব্যাপারটা অবশ্য এমন কিছু নয়। তক্‌মাপরা একজন আরদালী ভিতর থেকে বাইরে ছুটোছুটি করতে গিয়ে নাল-বাঁধানো জুতো দিয়ে সমীরের পা মাড়িয়ে দিয়েছে। সমীর মুখ ফিরিয়ে দেখলো ঘরের মধ্যে দুজন সাহেব—গতরাত্রে এদেরই নাক ডাকার শব্দ সে শুনেছে। ঘরের চারিদিকে অদ্ভুত সব অস্ত্রশস্ত্র সাজানো—বন্দুক, রাইফেল, বর্শা, টাঙ্গি—আরো কত কি। একধারে কতগুলো চামড়ার পোষাক। একপাশে খাবারের কতগুলো বাসনপত্র আর চামড়াবাঁধা বিছানার সরঞ্জাম। মাঝখানে টেবিলের ধারে দুজন সাহেব ব'সে পাইপ টানছে।

তাকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকতে দেখে একজন সাহেব বললে, কে তুমি?

সমীরের সহসা মুখ ফুটলো না, কিন্তু সাহেবের গলার আওয়াজে তার গা কেঁপে উঠলো। থতিয়ে কিছুক্ষণ পরে সে বললে, আমি বাঙ্গালী।

এ ঘরে শুয়েছিলে কেন? জানো এটা ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম?

সমীর বললে, রাত্রে বুঝতে পারিনি, স্যার।

কোথা যাবে তুমি?

আমি?—ঢোক গিলে সমীর বললে, আমি কাজ খুঁজতে বেরিয়েছি।—এই ব'লে সে চ'লে যাবার চেষ্টা করলো।

সাহেব তাকে পিছন থেকে ডেকে বললেন, দাঁড়াও।

সমীর ভয়ে ভয়ে থমকে দাঁড়ালো। দুইজন সাহেব নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ ক'রে পুনরায় বললেন, কি কাজ জানো তুমি?

ঘুমের জড়তা সমীরের চোখ মুখ থেকে তখনো কাটেনি। মুখে তার হঠাৎ উত্তর এলো না। আকাশ পাতাল ভেবে এক সময়ে সে বললে, কাজ দিলে করতে পারি।

একজন সাহেব বললেন, ছাখো, আমরা বেরিয়েছি শিকারে। আমাদের সঙ্গে একজন বয় ছিল, কিন্তু তার জ্বর হয়ে কাল সে ফিরে গেছে। সঙ্গে কুক আছে, কিন্তু একা সে পারবে না। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাকো তোমাকে বকশিস দেবো।

কি যেন ভেবে সমীর বললে, থাকবো।

এক কথাতেই সমীরের একটা কাজ জুটে গেল। কুক তাকে নিয়ে গেল নিজের কাছে। তারপর তাকে সব রকম কাজ বুঝিয়ে দিল। সমীরের পরণে ধুতি চলবে না। আগের বয়টা ছিল কুকেরই ছেলে, সে বাড়ী যাবার সময় বাপের কাছে তার খাকি পোষাকটা রেখে গিয়েছিল। সেই হাফপ্যাণ্ট আর মোজা প'রে সমীর প্রস্তুত হয়ে নিল। প্রৌঢ় কুক তাকে কিছু খাইয়েও দিল। চাকুরী তার এমন কিছু নয়। সাহেবদের বন্দুক ধরা, কার্ত্তুজ আর বুলেট এগিয়ে দেওয়া, ফাইফরমাস খাটা, আর সব সময়ে কাছে কাছে থাকা। বুড়ো কুক এক সময়ে তার কানে কানে ব'লে দিল, সাবধান, ওদের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, আর একজন পুলিশ অফিসার। একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু বিপদ!

সমীর তার সমস্ত উপদেশগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে নিয়ে একসময় সাহেবদের কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। সাহেবরা হাসিমুখে বললেন, এবার ঠিক হয়েছে, বয়। যাও, কুলী ডেকে আনো, আমাদের যাবার সময় হয়েছে।

সমীর বেরিয়ে গেল।

ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে অন্যান্য কর্ম্মচারীরা এসে সাহেবদের সেলাম জানিয়ে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। এমন একটা ছোট ষ্টেশনে সচরাচর এত বড় সাহেব-

সুবার আবির্ভাব প্রায়ই ঘটেনা। দূরের মাঠের কিনারায় মেঘের মতো পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে, তার পাশ দিয়ে ছোটনাগপুর আর ধলভূমের পথ চ'লে গেছে। সাহেবরা ছুটি নিয়ে চলেছেন শিকারের সন্ধানে। জুন মাসের প্রায় মাঝামাঝি,—বৃষ্টিবাদলের আগেই তাঁরা শিকার ক'রে ফিরে যাবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ সাহেবের মালপত্র হারাবার কোনো ভয় নেই,—সুতরাং সেগুলো একখানা বড় মোটর বোঝাই ক'রে কুকের সঙ্গে কোথায় যেন পাঠিয়ে দেওয়া হোলো। সাহেবদের যাবার জন্য স্থানীয় হাকিমের মোটর প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়ালো। সকালের দিকে এরই মধ্যে রোদ গরম হয়ে উঠেছে, সুতরাং আর বিলম্ব করা সম্ভব নয়। অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিয়ে সমীর তাঁদের গাড়ীতে তুলে দিল।

আজ সত্যই যেন তার একটু ভালো লাগছে। পোষাকটা তার পক্ষে নতুন, সাহেবদের সঙ্গে মেলা-মেশাও এই তার প্রথম। কোথায় সে চলেছে তার কিছু জানা নেই, কবে সে ফিরবে তাও তার অজ্ঞাত। কিন্তু এটুকু দেখা গেল, ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলে একটা না একটা ব্যবস্থা শেষ পর্য্যন্ত হয়েই যায়। ড্রাইভারের পাশে সে ব'সে রয়েছে,—মোটর চলেছে হু হু শব্দে। দুইধারে রুক্ষ মাঠ, মাঝে মাঝে হিন্দুস্থানী জংলী গ্রাম। এক এক সময়ে ছোট ছোট শীর্ণ জলাশয় তার চোখে পড়ছে, তার ধারে বক আর মাছরাঙ্গা ঘুরছে। পলকে পলকে

তার চোখে মুখে নতুন নতুন আবিষ্কারের আনন্দ। সত্যি বলতে কি, আজ যেন তার খুশী আর ধরছে না। তার নতুন পোষাক, নতুন চাকরী, নতুন তার জীবন। বাড়ীর কথা আর সে ভাববে না। অন্ধ গুহার মধ্যে সে বন্দী ছিল,—সেখানকার স্নেহ-ভালোবাসা তাকে অস্বাস্থ্যকর অন্ধকারের মধ্যে বেঁধে রেখেছিল; কিন্তু সে বেরিয়ে এলো আলোর মাঝখানে, একটা জীবন্ত পৃথিবীতে। এখানে স্নেহ-ভালোবাসার চেয়েও বড় জিনিস আছে—আলো, বায়ু, স্বাস্থ্য, শক্তি,—এখানে আছে তার জন্য অবারিত মুক্তি। বাড়ীর কথা ভুলতে পারলে সে খুশী হয়।

প্রখর মধ্যাহ্ন রোদে এক সময় সাহেবদের মোটর এসে দাঁড়ালো এক পাহাড়ের ঢালুপথের গায়ে। কাছেই একটা বাগান, তার ভিতরে দক্ষিণ কোণে এক ডাকবাংলা। গাড়ী থামতেই কয়েকজন জংলী এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকতে লাগলো। সমীর তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে সাহেবদের জিনিসপত্র ভিতরে নিয়ে চললো। কুক তাদের আগেই এসে পৌঁছেছে। সে রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি সমীর সাহেবদের জন্য দুখানা ইজি চেয়ার এনে বারান্দায় পাতলো।

সময় বেশী নেই। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আহারাদি সেরে

সাহেবরা তাঁদের বন্দুক পরীক্ষা ক'রে এক সময়ে বললেন, এবার আমরা জঙ্গলে গিয়ে ঢুকবো।

গাইড প্রস্তুত হয়ে এসে সাহেবদের কাছে রাস্তাঘাটের কথা বলতে লাগলো। জঙ্গলের ভিতরে মাচান বাঁধা আছে, 'ঝালোয়া'র জন্য জংলী লোকরাও প্রস্তুত। জানোয়ারকে তারা ঘিরবে না, কেবল একদিক থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। লোকজন বেশী থাকলে চলবে না, তবে সাহেবরা সমীরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হলেন। গাড়ী কিছুদূর অবধি যাবে, তারপর জঙ্গলের মধ্যে হাঁটাপথ আরম্ভ। খাবারের কিছু কিছু সরঞ্জাম নিয়ে সমীর গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। কুক যাবার সময় চুপি চুপি ব'লে দিল, সাবধান, বেটা।

ডাকবাংলা থেকে গাড়ী বেরিয়ে চললো দক্ষিণ পাহাড়ের দিকে। মাঝপথে একটা চওড়া নদী,—নদীতে স্রোত কম, কিন্তু একদিকে বালু বেশী। তাদের বেরোবার আগেই জংলীরা জঙ্গলের দিকে যাত্রা করেছে। নদীর পারেই পাহাড়ী জঙ্গল। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত হয়ে চলেছে। সেদিকে মানুষের আবাস কোথাও নেই। প্রকাণ্ড নদীর সাঁকো পার হয়ে মোটর জঙ্গলের দিকে ধাওয়া করলো। আকাশে অপরাহ্ণের রোদ টা টা করছে, কিন্তু জঙ্গলের ভিতর দিকটা এই দিনের বেলাতেও যেন অন্ধকার। সেখানে হিংস্র জন্তু জানোয়ার আর সরীসৃপ চ'রে বেড়ায়।

সমীরের আজ খুব আমোদ। তাদের সেই পেনিটির বাঁশবাগানের ধার দিয়ে অনেকদিন আগে বাবার সঙ্গে যাবার সময় একবার জঙ্গল দেখেছিল, কিন্তু সেই ঝোপঝাড় আর আজকের এই জঙ্গল এক কথা নয়। আজকে তার মনের ভিতর থেকে যেন এক দুরন্ত তরুণ জেগে উঠে ওই জঙ্গলের দিকে অভিযান করছে। মনের ভিতরকার খুশী যেন সে আর চেপে রাখতে পারছে না।

নদীর পুল পেরিয়ে এসে একটা জলাশয়ের পাশ কাটিয়ে তাদের গাড়ী একটি গ্রামে এসে ঢুকলো। দুই তিনটি মাত্র কুঁড়ে আর ডালপালা ছাওয়া এক আধটি জংলীর ডেরা। এরা জঙ্গলে ঢুকে নাকি জন্তু মেরে খায়। মোটরের শব্দ শুনে সেই পাতার ঘর থেকে লেংটিপরা একজনবুনো লোক দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে হাত তুলে বললে, শ্—শ্—শ্—শ্......

চকিতে গাড়ী থেমে গেল। সমীরের পাশে ব'সে ছিল সেই বিশালকায় গাইড। তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে সে চাপাকণ্ঠে সেই লোকটিকে কি যেন জিজ্ঞাসা করলে।

বুনো লোকটি উত্তেজিত মুখ চোখ ঘুরিয়ে বললে, জান্‌বার !

কোথায় জানোয়ার হে ?—বলতে বলতেই সাহেবরা রাইফেল নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন।

আকণ্ঠ উতেজনায় সমীর চারিদিকে তাকাতে লাগলো।

চার

উলুবন আর কতকগুলো গাছের জটলার ভিতর দিয়ে সজাগ ও সতর্ক হয়ে সাহেবরা অগ্রসর হলেন। কিছুদূর এগিয়ে আসতেই আবার জানোয়ারের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সাহেবদের সঙ্গে গাইডও নিজের বন্দুক বাগিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এক মিনিট পরেই দেখা গেল, দক্ষিণ থেকে উত্তরের পথে তীব্র বেগে একটা বনশূয়োর ছুটে চ'লে গেল।

গাইড জিজ্ঞেস করলে, মারবো সাহেব?

সাহেবরা বললেন, না।

পিছনে সেই জংলী লোকটি হাতে বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বললে, হরিণ আসবে এবার···ভালো হরিণ। নীল গাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হরিণের নামে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু পুলিশ সাহেব সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন, বন্দুকের শব্দ পেলে বড় জানোয়ার কিন্তু পালাবে, মিঃ ফ্রেজার।

ফ্রেজার বললেন, বাঘ যদি না পাই?

অপেক্ষা করা দরকার। চলুন, এগিয়ে যাই।

গাইড তাঁদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হোলো। আকাশে তখন সূর্য্য একেবারে অস্ত গেছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু নীচেকার অরণ্যের চেহারা তখন অন্ধকার হয়ে

এসেছে। সমস্ত জঙ্গল ভরে সেই ছায়াময় অন্ধকারে ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে আরম্ভ করেছে।

পথ উঁচু নীচু, মাঝে মাঝে ছোট ছোট নালা একদিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে অন্যদিকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। পথের নিশানা কোথাও নেই, কিন্তু চারিদিকে কাঁটা লতায় আকীর্ণ। কাঁকর আর পাথর মাড়িয়ে হেঁটে যাওয়া দুঃসাধ্য। সেই পাথরের নুড়িতে আর কাঁকরে মেশানো রয়েছে ঘন বালু, কোথাও কোথাও এক ফুট দেড় ফুট অবধি সেই বালুময় পথ গভীর। গাইড তাঁদের সঙ্গে যেতে যেতে একবার দাঁড়িয়ে বাঘের পায়ের দাগ দেখিয়ে দিল। সেই দাগ একপ্রকার নয়—দু'তিন রকমের। সাহেব দুজন ত্রস্ত দৃষ্টিতে সেই দাগ পরীক্ষা করতে লাগলেন।

গাইড বললে, এই থাবা যে বাঘের, সেটা লম্বা প্রায় চোদ্দ ফুট। আর এটা যার, সেটাও দশ ফুটের ওপর। এটা বাঘিনীর দাগ।

টমাস সাহেব প্রশ্ন করলেন, তুমি এত জানলে কি ক'রে?

গাইড হেসে বললে, সাহেব, আমরা বাঘের দেশে মানুষ। জন্তু জানোয়ারের ইতিহাস আপনাদের চেয়ে আমরা অনেক বেশী জানি। আসুন তাড়াতাড়ি, এর পরে মাচান আর খুঁজে পাব না।

দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে যখন তাঁরা মাচায়

কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন, তখন সকলেই ঘর্ম্মাক্ত। হঠাৎ ফ্রেজার সাহেব ব'লে উঠলেন, কী সর্ব্বনাশ !

টমাস বললেন, কি ?

বন্দুক ত আছে সঙ্গে, কিন্তু টর্চ্চ ? খাবারের জিনিষপত্র ?

গাইড ব'লে উঠলো, তাইত, সাহেব !

একটু চা অথবা একটু জলের জন্য টমাসের গলা শুকিয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখানে কিছু পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া সেই লাঞ্চ খাবার পর থেকে পেটেও কিছু পড়েনি। ফ্রেজার সাহেব অনেকক্ষণ থেকেই ক্ষুধাবোধ করছিলেন।

টমাস বললেন, তোমার ত মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, মিঃ গাইড।

গাইড বললে, আমি আপনাদের পথ দেখাবো এবং শিকার করাবো,—আপনাদের ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনে করিয়ে দেওয়া ত আমার কাজ নয়। তাছাড়া হঠাৎ একটা উত্তেজনায় প'ড়ে আপনারা এগিয়ে এসেছেন।

ফ্রেজার বললেন, আমাদের বয়টারই বেশী দোষ। সে আমাদের খাবার কথা আর টর্চ্চের কথা মনে করিয়ে দিতে পারতো।

গাইড হেসে বললে, এটাও ভুল, সাহেব। সে আপনাদের হুকুমের চাকর মাত্র। নিজের থেকে সে আপনাদের রসদ

যোগাবে কেন? তা ছাড়া তাকে কোনো উপদেশ না দিয়েই আপনারা চ'লে এসেছেন।

বিবর্ণ মুখে টমাস বললেন, তাহ'লে এখন উপায়?

ফ্রেজার স্তব্ধ ও বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন।

গাইড বললে, এখন আর ফিরে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং মাচায় ব'সে চুপচাপ রাত কাটানো ছাড়া আর গতি নাই।

কিন্তু তার মানে? এখনো সাতটা বাজেনি তা জানো?

গাইড বললে, কিন্তু আর ত কোনো উপায় নেই। প্রাণের মায়া থাকতে এই অন্ধকারে এক পাও আর বাড়ানো চলবে না। জানোয়ার যদি হঠাৎ কোথাও থেকে আক্রমণ করে, বন্দুকে তখন কোনো কাজ হবেনা। সাহেব, একটা কথা আপনাদের জানিয়ে দিই, আপনারা ওদের রাজ্যে এসে বে-আইনী প্রবেশ করেছেন। ওরা চারিদিক থেকে আমাদের বেষ্টন ক'রে ওৎ পেতে রয়েছে জানবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, ওরা কিন্তু সব লক্ষ্য করছে। একটু অসতর্ক হলেই ওদের হাতে প্রাণ হারাতে হবে।

টমাস বললেন, কিন্তু সমস্ত রাত এভাবে কাটানো ত' অসম্ভব, গাইড।

গাইড এদিক ওদিকে তাকিয়ে হঠাৎ ফিস ফিস ক'রে বললে, উঠুন, শিগগির উঠুন মাচায়, তর্ক-বিতর্ক পরে হবে।

টমাস আর ফ্রেজার সাহেব একটা গাছের গুঁড়ির ওপর

ভর দিয়ে অন্য ডালে পা রেখে বহু পরিশ্রমে মাচার উপর উঠলেন।

এইটুকু সময়ের মধ্যেই অন্ধকার ঘন হয়ে উটেছে। আকাশে তখনও সামান্য আলোর আভাস ছিল, কিন্তু সে-আলোয় জঙ্গলের জটলা পেরিয়ে নীচের দিকে নামার কোনো পথ ছিল না। মাঝখানে এক সময় হঠাৎ আকাশটা ডেকে উঠলো, তারপরেই একবার বিদ্যুতের ঝলক জ্ব'লে উঠে আসন্ন ঝড়ের কথা জানিয়ে গেল।

মাচার উপর ব'সে তিনজনেই তিনজনের মুখের দিকে তাকালে। সঙ্গে আলোও যেমন নেই, তেমনি আজকে জ্যোৎস্না দেখা দেবার সম্ভাবনাও কম। অন্ধকারে কাছাকাছি জানোয়ার এলেও বন্দুক চালানো সম্ভব নয়। লক্ষ্য ভেদ করতে যদি না পারা যায় তবে বিপদ ঘটতে পারে। সুতরাং সমস্ত রাত এখানে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ব'সে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই।

দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সন সন শব্দ হ'তে লাগল। শব্দটা একদিক থেকে আসছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই শব্দ দ্রুত ও ভীষণ হয়ে যেন চারিদিক থেকে তাড়া ক'রে আসতে লাগল।

টমাস বললেন, ওটা কি হে?

গাইড বললে, ঝড় উঠেছে।

আমাদের মাচা ঠিক আছে ?

হঠাৎ কিসের ক্ষীণ আওয়াজ পেয়ে সকলে মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। ফ্রেজার কানে কানে বললেন, কি ওটা ?

গাইড বললে, জংলীরা আগে এসে আমাদের জন্যে 'কিল' বেঁধে রেখে গেছে,—সেই মোষের বাচ্ছাটাই সাড়া দিচ্ছে। জঙ্গলে বাঘের গন্ধ ওরা বুঝতে পারে। এই ঝড়ের মুখে জানোয়ার আজ তাড়া খেয়ে বেরোবে ব'লেই মনে হচ্ছে।

মনে মনে অনুশোচনা আর ক্ষোভ নিয়ে সাহেব ছুজন বিরক্তভাবে ব'সে রইলেন। এক সময় বললেন, এরকম শাস্তি আমরা কোনোদিন পাইনি। দেশালাই জ্বালিয়ে একটা সিগারেট খাবারও জো নেই।

জঙ্গলে ঝড়ের ডাক উঠলো। ভিতরে যেন শত শত দৈত্য প্রবেশ করেছে। গাছপালা মাড়িয়ে যেন অসুরের দুরন্তপনা আরম্ভ হয়ে গেছে। চারিদিকে গাছ ভাঙার পটাপট, দুমদাম শব্দ, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় অরণ্যের সেই বিভীষিকা যেন দপ ক'রে উঠছে, একবার বজ্রপাতের শব্দ পাহাড়ের গায়ে প্রতিহত হয়ে অরণ্যভূমি থর থর ক'রে কাঁপছে,—আর সেই ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যে এক একবার বন্য জানোয়ার আর নিরুপায় পশু-পক্ষীর নানারকমের বিচিত্র আর্ত্তনাদ জেগে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, কিন্তু ঝড় থামলো না।

এক সময়ে প্রবল বেগে বৃষ্টি নেমে এলো। জঙ্গলে ঝড়

বৃষ্টি যে কি ভয়াবহ, সাহেবদের সেই অভিজ্ঞতা ছিল না। গাইড এক সময় শুষ্ক মুখে বললে, যা ভয় করা গিয়েছিল তাই হোলো। আপনাদের ব'লে রাখলুম জুন মাসের মাঝামাঝি আর কোনোদিন শিকারে আসবেন না।

সাহেব নির্ব্বাক হয়ে ব'সে বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগলেন। তাঁদের উত্তর দেবার আর শক্তি ছিল না! কিন্তু ফ্রেজার সাহেব আর পারলেন না। পকেট থেকে রিগারেট বার ক'রে তিনি আর টমাস সাবধানে দেশালাই জ্বেলে সিগারেট ধরালেন, এবং সেই আলোতে দেখে নিলেন রাত ন'টা বেজে গেছে। এখনও অন্তত নয় ঘণ্টা এই ভাবে তাঁদের তিনজনকে অপেক্ষা করতে হবে। বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই তাঁদের পোষাক ভিজে জাব হয়ে উঠেছে।

হয়ত রাত তখন দশটাই হবে, এমন সময় সহসা দূরের থেকে ভীষণ একটা আওয়াজ শোনা গেল। গুলীর শব্দ, সকলেই বুঝতে পারলে। তারপরেই জানোয়ারের আর্ত্তনাদ, আর ওলোটপালটের দাপাদাপির শব্দ। এমন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার কেমন ক'রে ঘটতে পারে, এই মনে ক'রে ফ্রেজার বললেন, কি হে?

গাইড বললে, বোধ হয় মহম্মদ হোসেনের দল জঙ্গলে ঢুকেছে। ওদের আসবার কথা ছিল বটে।

জানোয়ার মারা পড়লো নাকি?

হ্যাঁ, বোধ হয় লেপার্ড মেরেছে। এত ঝড় বৃষ্টিতে··· বাহাদুরী বটে।

সাহেবেরা স্তব্ধ হয়ে ব'সে নিজেদের অক্ষমতার কথা ভাবতে লাগলেন।

হঠাৎ আর একটা গুলীর আওয়াজ, তারপরে অরণ্য একেবারে নীরব। বৃষ্টির সপাসপ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

কিছুক্ষণ পরে জঙ্গলের ঘন গাছপালার ভিতর দিয়ে আলোর রেখা দেখা গেল, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন জংলী-লোকের সমবেত উচ্চকণ্ঠের চীৎকার কানে এলো।

ফ্রেজার বললেন, আজকে যখন আর শিকারের সম্ভাবনা নেই, তখন তুমিও সাড়া দাও, গাইড।

গাইড প্রস্তুত হয়েই ছিল। সে সাড়া দিয়ে এদিক থেকে চেঁচিয়ে উঠলো।

আলো আর লোকজনদের এইদিকে অগ্রসর হ'তে দেখে সাহেবরা একটু উৎসাহিত বোধ করলেন। আজকের এই দুর্যোগ থেকে অন্ততঃ রেহাই পাওয়া দরকার।

উভয় পক্ষ থেকে অবিশ্রান্ত সাড়া দেবার পর শিকারী মহম্মদ হোসেনের দল জঙ্গল পেরিয়ে জলকাদার ভিতর দিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে এলো। কিন্তু মাচা থেকে নামবার আগেই লক্ষ্য ক'রে জানা গেল, ওদের মধ্যে মহম্মদ হোসেনের দলের

নামগন্ধও নেই। মাত্র গুটি কয়েক জংলী লোক। একজনের মাথায় টর্চ্চের ব্যাটারি, আর অন্যদের হাতে টাঙি, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্র। দু একজন আরো যেন কি মালপত্র বয়ে এনেছে।

টমাস সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন, ওদের মধ্যে রাইফেল হাতে নিয়ে সমীর দাঁড়িয়ে। তাঁরা সকলেই মাচা থেকে নেমে এসে বললেন, তুমি ?

হাঁ, স্যার।

তুমি রাইফেল ছুড়েছিলে ?

তার সঙ্গের লোকেরা কলরব ক'রে জানালে, সমীর একটা প্রকাণ্ড চিতা বাঘ মেরেছে, সেটা প'ড়ে রয়েছে ওই ওদিকে।

তিনজনেই একেবারে হতবাক।

ঘটনাটা এই। সাহেবেরা চ'লে আসার পর সমীর অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রইল। তাঁদের চা খাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তাঁরা ফিরলেন না। এদিকে কিছু তারা বলেও যাননি। সঙ্গে তাদের টর্চ্চ নেই, সুতরাং রাত্রে শিকারও হবেনা। অথচ তাঁরা গেলেন কোথায়, এই নিয়ে সমীর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। আগেকার সেই জংলী লোকটার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সমীর স্থির করলে, যেমন ক'রেই হোক, আলো আর খাবার জল সাহেবদের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে।

কিন্তু অন্ধকারে বন্দুক ছাড়া কিছুতেই জঙ্গলে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং একটা বন্দুক নিয়ে জিনিসপত্র সমেত জংলীদের

সঙ্গে সে জঙ্গলে ঢুক্‌লো। কিন্তু তারা হঠাৎ এক সময় বাঘের অস্তিত্ব টের পায়। তখনও বৃষ্টি থামেনি। সমীর কখনও বন্দুক ছোড়েনি, কেবল বন্দুক ছোড়ার কৌশলটা সে সাহেবদের কাছে শিখে নিয়েছিল। তার সঙ্গের জংলী সর্দ্দার যখন টর্চ্চ তুলে একটা উল-ঝোপের ধারে বসা একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ দেখালে, সমীর আর লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। সাহসে ভর ক'রে সে রাইফেলটা বাগিয়ে তুলে গুলী করলে। গুলীটা ফসকালে যে তার জীবন বিপন্ন হ'তে পারত, একথা তা'র একবারও মনে হয়নি। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় গুলীটা গিয়ে লাগে বাঘের কাঁধের কাছে। ফলে তার কাঁধ ভেদ ক'রে গুলী চ'লে যায়। বাঘটা আর্ত্তনাদ ক'রে লাফিয়ে উঠে প'ড়ে যায়। সমীর আর একটা গুলী মারে তা'র পাঁজরে। বাঘটা মরবার আগে একজন জংলী গিয়ে বর্শার ফলকে তার গলা বিঁধিয়ে দেয়। বাঘের মৃত্যু ঘটে।

দলবল সঙ্গে নিয়ে ফ্রেজার আর টমাস সাহেব সেই ঘটনা-স্থলের দিকে যাত্রা করলেন। ঝড় বৃষ্টির পরে গাছ পালা ভেঙ্গে পথ দুর্গম হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে নালা নর্দ্দমায় জল জমেছে। কোথাও নরম বালুতে পা ডুবে যায়, কোথাও পাথরের টুকরোয় হোচট লাগে। বহুক্ষণ সেই অগম্য জঙ্গলের পথ কোন মতে অতিক্রম ক'রে তাঁ'রা এসে পৌছলেন। জংলীরা সেই মরা বাঘটাকে দেখিয়ে উল্লাস করতে লাগলো। গাইড এক সময়ে

সাবধান ক'রে বললে, এখানে দেরী করবেন না, ওর জুড়িটা বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও আছে।

সাহেবরা উৎকর্ণ হয়ে বন্দুক বাগিয়ে সাবধানে অগ্রসর হলেন। বাস্তবিক, বাঘটা প্রকাণ্ড। লেজস্থদ্ধ এগারো ফুটের কম নয়। স্থির হোলো, কাল সকালে জংলীরা মরা বাঘটার ব্যবস্থা করবে। আজকে যখন আর শিকার সম্ভব নয়, তখন থেকে বেরিয়ে নদী পেরিয়ে ডাকবাংলায় ফিরে যাওয়াই দরকার।

শিকারের প্রথম অভিযানটা যে এই ভাবে নষ্ট হবে, ফ্রেজার সাহেব কল্পনাও করেন নি। নিজের হাতে না মারতে পারলে যত বাঘই মরুক, আনন্দ নেই। ঘটনাচক্রে তাঁদের বয় যে আবার একটা বাঘ মেরে বসবে, একথা কে জানতো? তাঁরা এলেন এত উদ্যোগ-আয়োজন ক'রে, জল-ঝড়ে কষ্ট পেয়ে এলেন, আর বাঘ মারা পড়লো একটা আনাড়ি ছোকরা চাকরের হাতে? সাহেবরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন।

সকালবেলা ট্রে সাজিয়ে নিয়ে সমীর তাঁদের প্রাতরাশ দিতে এলো। টমাস সাহেব বললেন, বয়, তোমার এই বীরত্ব আর সাহসে আমরা সুখী হয়েছি। কিন্তু—

সমীর বিনয় সহকারে মুখ তুলে তাকালো। দেখলে, সাহেবদের মুখে চোখে গত রাত্রির মতোই ঈর্ষা আর সন্দেহ ফুটে উঠেছে।

টমাস পুনরায় বললেন, কিন্তু সমস্তটাই তোমাদের ষড়যন্ত্র। তোমাদের চালাকি। এ চালাকির সঙ্গে গাইডও জড়িত, আমরা বুঝতে পেরেছি।

সবিস্ময়ে সমীর বললে, চালাকি কিসের, স্যার ?

আলবৎ চালাকি। গাইড আমাদের অন্য পথে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে টাকা বেশী চায়। আর তোমার সঙ্গে জংলীদের পরামর্শ ছিল।

সমীর বললে, এ সত্যি নয়, সাহেব।

আলবৎ সত্যি। তুমি বেশী কথা বললে এখনই শাস্তি দেবো। পাজি, নচ্ছার কোথাকার। আমাদের শিকারটা মাটি ক'রে দিলে। নেটিভদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই।

সাহেবদের কথা শুনে আকণ্ঠ ঘৃণায় সমীরের মনের ভিতরটা রি রি ক'রে উঠলো ; দুজনের একজন হাকিম, অপরজন পুলিশ সাহেব, সুতরাং মাথা হেঁট ক'রে তাঁদের কটূক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। চায়ের ট্রে-টা রেখে নতমুখেই সমীর চ'লে গেল, এবং তাকে নির্ব্বাক দেখে সাহেবদের সংশয় আর অবিশ্বাস আরো দৃঢ় হোলো।

বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ মেনে নিয়ে চাকরী করা চলে না। কাজটা তার ভালোই জুটেছিল, কিন্তু আত্ম-সম্মান আর চাকরী—এ দুটো একসঙ্গে রাখা সম্ভব নয়।

রান্নাঘরে সমীর ফিরে এসে দেখলে, বুড়ো বাবুর্চ্চি মাংস

ছাড়াচ্ছে। দুজনে চোখাচোখি হ'তেই সমীর কঠিন করুণ কণ্ঠে বললে, মেহেরালি, আমি চললুম।

কোথা যাবে বাপজান ?

চাকরী আমি ছেড়ে দিলুম। কিন্তু তোমার মনিবদের বলো—সমীর একটু থামলো, তারপর আবার বললে, সাহেবরা এদেশে প্রিয় নয়। তবু এদেশে যারা ওদের ভালোবাসতো, তাদের কাছেও ওরা একদিন মান খোয়াবে।

হাফপ্যাণ্টটা ছেড়ে সমীর নিজের আগেকার সেই ধুতিখানা প'রে মেহেরালিকে সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল। বুড়ো নির্ব্বাক হয়ে তা'র পথের দিকে চেয়ে রইল।

ডাকবাংলার বাইরে আসতেই গাইডের সঙ্গে তার দেখা। গাইড আসছিল সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে। সমীরকে দেখে সে এগিয়ে এসে করমর্দ্দন ক'রে বললে, কালকে তোমার সাহস দেখে আমরা সত্যিই অবাক হয়েছিলুম, বয়।

সমীর বললে, আমার নাম বয় নয়, আমি সমীর। গাইড সাহেব, আমি ওদের চাকরী ছেড়ে যাচ্ছি।

কেন ?

আমি নাকি তোমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে ওদের বাঘ মারতে দিইনি।

গাইড বিস্মিত হয়ে বললে, সে কি, এমন আজগুবি কথা সাহেবের মুখে বেরোয় ? আচ্ছা দেখি ত—

কয়েক পা গিয়ে গাইড আবার ফিরে দাঁড়ালো। যাকে বয় ব'লে জানা ছিল, সে যখন হঠাৎ সমীর হয়ে উঠলো, তখন সে-ছেলে সাধারণ নয়। গাইড জীবনে অনেককে দেখেছে। ফিরে দাঁড়িয়ে সে বললে, চাকরী ছেড়ে ত' দিলে, কিন্তু এই বিদেশ-বিভূঁয়ে তুমি যাবে কোথায় ?

দূরের মাঠের দিকে সমীর তাকালে। এই বিশাল প্রান্তর পার হয়ে গেলে তবে আর একটা গ্রাম পাওয়া যাবে। এখানকার ছোট সহরে যদি কিছু একটা কাজ পাওয়া যেতো, তবে সে থাকতে পারতো। কিন্তু সাহেবদের এই চাকরী ছাড়বার পর এ অঞ্চলে তার অন্ন জুটবে ব'লে মনে হয় না। তা'কে চ'লে যেতেই হবে।

গাইড বললে, কই, উত্তর দিলে না যে ?

সমীর বললে, হাঁটতে হাঁটতে যতদূর যাওয়া যায়, তারপর কি হবে বলতে পারিনে।

কাছে এসে গাইড তা'র কাঁধে হাত রাখলে। বললে, যারা বীরের জাতি হয়েও তোমার বীরত্বের দাম দিল না, তারা যত বড় সাহেবই হোক, তাদের সঙ্গে যাবে তুমি ?

তার চেয়ে চলনা আমার সঙ্গে ?

সমীর বললে, কোথায় ?

এই ধরো আমার বাড়ীতে ?

না। আমি একাই যাবো গাইড সাহেব !

বেশ ত, তাই যেয়ো। কিন্তু একটা প্ল্যান্ ক'রে না গেলে কোথায় ঘুরবে ছেলেমানুষ হয়ে? আমার ওখানে এক আধ দিন বিশ্রাম নিয়ে তারপর যেয়ো।

সমীর কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়ালে। তারপর একটু হেসে বললে, আজ যারা ভাল কাল তারাই মন্দ হয়ে ওঠে। তুমিও ত তাদের দলে যেতে পারো, গাইড সাহেব।

গাইড বললে, না, তা মোটেই নয়। আমি তোমাকে কাজে লাগাবো ব'লেই নিয়ে যাচ্ছি।

কি কাজ?

তোমার হাতে বন্দুক দেবো, তুমি থাকবে আমার কাছে কাছে। আমার গমের কারবার আছে, তুমি তা'র তদারক করবে। একটা ভালো ঘোড়া আছে, তুমি সেটায় চ'ড়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে। এই সহরটা ছাড়ালেই আমার বাড়ী। রাজী ত?

পাঁচ

গাইড সাহেবের গ্রামখানি ছোট, সহর থেকে মাত্র মাইল পাঁচেক দূরে। কয়েক ঘর মাত্র বস্তি, তা'রা সবাই হিন্দুস্থানী। গ্রামে ঢোকার আগে একটা তোরণ পাওয়া গেল—সেটি অতি জরাজীর্ণ। ইতিহাসের কোন যুগে যেন মুসলমানরা এই অঞ্চল আক্রমণ করেছিল, তাদের বিজয়চিহ্ন স্বরূপ আজও এই তোরণটি দাঁড়িয়ে। তোরণের নাম হনুমান-ফটক।

তোরণ পেরিয়ে গ্রামে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে, কয়েকটা তালগাছ ঘেরা একটি স্বচ্ছ সরোবর। সেখানে শালুকের দল ফুটে রয়েছে। কিছু দূর গেলে একটা ইঁদারা, সেখানে গরুর গলার সঙ্গে দড়ি বেঁধে বাকেটের সাহায্যে নীচের থেকে জল টেনে তোলা হচ্ছে। তখন অপরাহ্ণ বেলা। হিন্দুস্থানী মেয়েরা থালা আর লোটা মাজতে বসেছে।

গাইড সাহেবের সঙ্গে সমীর গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে এসে একটা বড় উঠানে ঢুকলো। বাড়ীটা প্রকাণ্ড। আশপাশে কয়েকটা চালা ঘর—কোনোটায় বড় বড় গরু; কোনোটায় ছাগল আর ভেড়া, কোনোটায় বা গোটা তিন চার মেঠো ঘোড়া। এদিকের একটা চালায় কি একটা কাঠের যন্ত্রের শব্দ শুনে সমীর মুখ ফিরিয়ে দেখলে, সেখানে দুধের থেকে মাখন

তোলা হচ্ছে। এবং তারই ওাপঠে বড় বড় গোটা দুই জাঁতা নিয়ে ব'সে জন চারেক পাট্টা জোয়ান ডাল ভাঙছে। গাইড সাহেব ভিতরে এসে ঢুকতেই সকলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। তাদের মনিব এসেছে।

বাড়ীর পাকা অংশটা খুব বড় নয়। কিন্তু গ্রামের মধ্যে এইটিই একমাত্র পাকা দালান। বলা বাহুল্য, গাইড সাহেবই এখানকার জমিদার,—তার প্রতাপে নাকি বাঘে গরুতে একত্র জল খায়। তার লোক-লস্কর, তার প্রকাণ্ড খাসমহল, বহু সংখ্যক প্রজা, বিপুল পরিমাণ গৃহপালিত পশু এবং তার ঘরে ও মাটির তলায় নাকি সারি সারি লোহার সিন্দুক সাজানো। গাইড সাহেব বাইরে ছিল কেবলমাত্র শিকারী, কিন্তু নিজের এলাকায় এসে দাঁড়াতেই দেখা গেল, সে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার; প্রতিপত্তি আর শাসন ব্যবস্থায় সে ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিশ সাহেবের অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। অমন দশ বিশ জনকে গাইড সাহেব এক হাটে বিক্রি করে অন্য হাটে কিনে নিতে পারে।

পাকা দালানের দক্ষিণ দিকের একখানা ঘর সমীরকে দেওয়া হোলো। চুণকাম করা ঘরের বাইরে ও ভিতরে নানা প্রকার রামায়ণি ছবি আঁকা। কোথাও বীর হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত মাথায় নিয়ে শূন্যে উড়ে চলেছে, কোথাও সীতা-রামের রাজ-অভিষেক, কোথাও সীতাহরণ, আবার কোথাও রাবণ।

রাজার দশমুণ্ড। লাল, নীল, হলুদ—নানা রং। দরজার বাইরে মস্ত বড় বাগান, সেখানে পেঁপে, কাঁচা ডালিম, শিউলী আর নিমের জঙ্গল। বাগানের একপাশ দিয়ে গ্রামের পথ মাঠের দিকে চ'লে গেছে। ঘরখানার মধ্যে আসবাবপত্র কিছু নেই, কেবল একধারে খান দুই দড়ির খাটিয়া পাতা। কড়ি-কাঠের কাছাকাছি একটা মাচা,—সেখানে হাঁড়িকুঁড়ি, ঝুড়ি, একটা সড়কি, কয়েকটা চামড়ার রাশ, আর খান কয়েক তাল-পাতায় বোনা চাটাই।

এদিকটা বা'র বাড়ী, কিন্তু ভিতর মহলে পরিবারবর্গের কোনো চিহ্ন সমীরের চোখে পড়লো না। বাড়ীতে কোথাও শিশু নেই, স্ত্রীলোক নেই—কেমন যেন রুক্ষভাব, কেমন যেন থমথমে চারিদিক। সে নতুন এসেছে, তাই প্রথমেই সমস্তটা বুঝতে না পেরে তার কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। একটা আতঙ্কের ছায়া যেন ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। কিন্তু ভাগ্যের হাতে সে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে, কোথাকার স্রোত তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার ঠিক নেই,—সুতরাং ভয় করলে তার চলবে না।

গাইড সাহেবের নাম রঘুনন্দনপ্রসাদ। এ অঞ্চলের লোক তাকে রঘুজি ব'লে ডাকে। হিন্দুস্থানী জমিদার তার চলন-ধরণে আভিজাত্য রাখতে জানে না। রঘুজি তার লোক-লস্কর আর চাকরবাকরদের সঙ্গে বসেই তামাক খায়। একদিন

সমীরকে ডেকে সে বললে, দেশের জন্যে কি তোমার মন খারাপ হচ্ছে গোঁসাই ?

সমীর বললে, একটুও না রঘুজি। আমি বেশ ভালো আছি।

রঘুজি বললে, এখানে আমি তোমাকে জমিন্ দেবো, তুমি চাষ লাগাবে। বন্দুক অভ্যাস করছ কেমন, গোসাঁই ?

সমীর হাসিমুখে বললে, এখন বেশ হাত দুরস্ত হয়েছে।

খুব ভালো। তুমি বড় শিকারী হ'তে পারবে।

কথাটা মিথ্যা নয়। কয়েকদিন আগে এখান থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে রাঙ্গাগাঁওয়ে গিয়ে সমীরের দল পূর্ণিমার রাত্রে বনশূয়োর মেরে এনেছে। একটা বাঁধের নীচে সে নিজে বসেছিল। তা'র এই দুঃসাহস দেখে দলের অনেকেই মানা করেছিল, কারণ ওইটিই শূয়োরের পালাবার একমাত্র পথ। কিন্তু সামনা সামনি শিকার আসতেই সমীর রাইফেল ছোড়ে। এক গুলীর ঠিক পরে আর এক গুলী। পাঁজর ভেঙেও শূয়োর তাকে আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু যে দুঃসাহসী একদিন বাঘ মারতে ভয় পায়নি, সে শূয়োরের তোয়াক্কা রাখলো না। শিকারের কপাল লক্ষ্য ক'রে তৃতীয় গুলী সে ছুড়লো। বাস্, ওতেই শেষ।

কিন্তু শিকারের শিক্ষা ছাড়াও সমীর ঘোড়ায় চড়া শিখতে লাগলো। বর্ষাকালে একটু অসুবিধা, তবু ওরই মধ্যে রঘুজির

এক চাকরকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘোড়া বার ক'রে আনতো মাঠের মধ্যে। মাঠের ঘোড়া, খুব তেজীয়ান নয়, কিন্তু শিখবার পক্ষে এইটিই ভালো। সমীর শুনেছিল বাঙ্গালী ভীরু, বাঙ্গালী দুর্ব্বল, বাঙ্গালীর অধ্যবসায় কম। সে ঠিক করলো, এই বদনাম তা'কে ঘোচাতেই হবে। অন্ততঃ একজনও যদি সাহস ক'রে বলতে পারে, বাঙ্গালী ভীরু নয়, বাঙ্গালীকে ভীরু আর অকর্ম্মণ্য ক'রে রাখার জন্যে এটা স্বার্থবাদীদের একটা চক্রান্ত—তবে সে ধন্য হবে। সে দুর্জ্জয়ের সাধনা করবে। দুষ্প্রাপ্যকে ছিনিয়ে আনবার জন্য সে জীবনপণ করবে,—সুতরাং শক্তির চর্চ্চায় তা'র জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

তিন চার মাস ধ'রে অক্লান্ত উৎসাহে সে ঘোড়ায় চড়া শিখলো। যে ঘোড়াটা রঘুজির নিজস্ব, সেইটির উপর চড়ে এক একদিন সমীর বিশ ত্রিশ মাইল ভ্রমণ ক'রে আসে। মাস দুই আগে একটা খানা ডিঙোতে গিয়ে ঘোড়া থেকে সে প'ড়ে গিয়ে আহত হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই আবার সুস্থ হয়ে ওঠে।

শীতকালের দিকে সমীর ব্যায়ামচর্চ্চা আরম্ভ করলো। এ বয়সটা যেন তা'র প্রস্তুত হওয়ার যুগ—এর পরে যেন তা'র অনেক কাজ বাকি আছে। বড় একটা যুদ্ধের সম্ভাবনায় এক একদেশ যেমন ভিতরে ভিতরে তা'র সকল প্রকার সামরিক শক্তিকে প্রস্তুত করতে থাকে, সমীরও তা'র ভবিষ্যৎ জীবনের

দিকে তাকিয়ে তেমনি সতর্ক হয়ে শক্তি ও স্বাস্থ্যচর্চ্চা আরম্ভ করে দিল একাগ্রতার সঙ্গে। সমস্ত দিন সে ক্ষেত-খামারে থাকে কোন-না-কোন কাজ নিয়ে। বড় বড় বস্তা নিজে সে বয়ে আনে, নিজে কাঠ কাটে, বেড়া বাঁধে এবং রঘুজির লোকদের সঙ্গে পালোয়ানি ক'রে। প্রথম দিকে ভাত না খেতে পেয়ে তা'র বাঙ্গালী রুচি একটু কষ্টভোগ করেছিল। কিন্তু ইদানীং সে ভুট্টা আর আটার চাপাটি খায়। ছোলা, মটর, কড়াই—এই সব তার প্রিয়। সমীর একেবারে হিন্দুস্থানী বনে গেল। তার আর কোনো আশা নেই।

এই ভাবে দীর্ঘকাল চ'লে গেল।

বছর খানেক তা'র কাটলো হিন্দুস্থানীদের মুলুকে। সমীর তার প্রিয় বাঙ্গলা দেশের কথা ভুলে গেছে। এখন তা'র নতুন জীবন, নতুন পথ। সে কোমরে জড়িয়ে কাপড় পরে, মির্জাই গায়ে চড়ায়, মাথায় টুপি পরে, মুখে তার পরিষ্কার হিন্দি ভাষা। সমীরের আর কোনো আশা নেই।

তা'র দেশের লোক এলে এখন আর তা'কে চিনতে পারবে না। তা'র সেই সুন্দর গায়ের রং এখন আর নেই; রোদে রোদে ঘুরে সে রোদ-পোড়া হয়ে গেছে,—গায়ের রং চকচকে তামার মতো। সেই নধর সুকুমার শরীর আর নেই, স্বাস্থ্য এখন তা'র শক্ত, নীরেট,—হাতের আঙ্গুলগুলো গাছের

ডালের মতো কঠিন। ঘোড়ার কেশর ধ'রে আজকাল এক হাতেই সে বাগ মানায়। সে আজকাল ভীষণ সাহসী।

কিন্তু একটা ব্যাপারে এখানে এসে নিজেকে সে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারেনি। রঘুনন্দনের জমিদারীর শাসনরীতি তার কাছে যেন আপত্তিকর মনে হোতো। সম্প্রতি প্রজাদের কাছে খাজনার কিস্তি আদায়ের একটা মরশুম চলছিল। দিন কয়েক আগে এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে এক জঙ্গলের কয়েকজন গরীব প্রজা খাজনা শোধ করতে সমর্থ হয় নি। রঘূনন্দনের লোকেরা গিয়ে বলে, খাজনা না দিলে জঙ্গল কেটে নিয়ে যাবো। কিন্তু জঙ্গল কাটলে গরীব প্রজাদের সর্ব্বনাশ। এই নিয়ে দুই দলে খুব গণ্ডগোল বাধলো। অবশেষে রঘুনন্দনের লোকেরা গোপনে গিয়ে সেই জঙ্গলে একদিন রাত্রে আগুন লাগিয়ে আসে। রোদপোড়া শুকনো জঙ্গল দেখতে দেখতে বারুদের মতন জ্বলে ওঠে, এবং প্রবল বাতাসে সেই আগুন সমস্ত জঙ্গলেই কেবল ছড়িয়ে পড়েনি, প্রজাদের ঘরগুলি সেই সঙ্গে ভস্মীভূত হয়। সমীর আগে থেকেই এই সংবাদ জানতে পেরেছিল, কিন্তু বহু অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও রঘুজীর মন টলাতে পারেনি। সে নিজের ঘরে বসেই মাঠের পারে সেই আগুনের শিখা আর রক্ত-রঙীন আকাশ সারারাত্রি ধ'রে দেখতে লাগলো।

রঘুনন্দন তা'কে দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিয়েছে, তা'কে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। কিন্তু তার এই স্নেহের আড়ালে যে একজন

ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর লোক ব'সে রয়েছে, আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে সমীর সেই কথাই ভাবতে লাগলো। যাকে সে অনেকটা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসনে বসিয়েছে, তা'র স্বভাবে সে এতখানি নিষ্ঠুরতা দেখবে, একথা কল্পনাও করেনি।

আর একজন প্রজার প্রতিও ভয়ানক দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। তা'র ঘরের গরু ছাগল, বাসনপত্র, কাপড় চোপড—সমস্ত লুঠ ক'রে রঘুজির লোকেরা নিজেদের ঘরে এনে রেখে দেয়। কেবল তাই নয়, তাদের গোলা থেকে ধান, গম, কলাই,—সমস্ত লুঠ করে আনা হয়। গরীব প্রজা অবশ্য গোলমাল করেনি, কেবল হাতে পায়ে প'ড়ে কেঁদেছিল মাত্র। গ্রামের চৌকিদার রঘুনন্দনের ঘুষখাওয়া লোক; থানার লোকেরাও কি জানি কি কারণে তা'র কথায় ওঠে-বসে! সুতরাং সেদিক থেকেও এই অন্যায়ের কোনো প্রতিকার নেই। যে লোকটা সত্যবাদী, সমীরের প্রতি যার এতখানি উদারতা,—দুর্ব্বল প্রজার প্রতি সে যে এতখানি নির্দ্দয় হ'তে পারে, এ যেন বিশ্বাস করা যায় না। তা'র মনে হোলো, সে যেন একদল ডাকাতের মধ্যে বাস করছে। আর এই ডাকাতের দল যে চিরকাল ধ'রে গরীবের ওপর জুলুম চালিয়ে যাবে, এই কথা মনে ক'রে সমীরের সমস্ত মনটা যেন কুঁক্‌ড়ে উঠলো।

সে যে নিজেও এই দলের একজন লোক, একথা আশপাশের গ্রামে জানাজানি হয়ে গেছে। একবার পাখী

শিকারের জন্য সে দিন দুই ধ'রে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেদিন দুপুর বেলায় এক গ্রামের পথ ফিরবার সময় সে অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হয়ে সেই গ্রামের লোকের কাছে জল চায়। কিন্তু সে রাঙ্গাগাঁয়ের লোক, এই কথা শোনামাত্র গ্রামের লোকেরা তা'র প্রতি মুখ বেঁকিয়ে চ'লে যায়—এক ফোঁটাও জল দেয় না। সমীর ফিরে এসে এই খবর কারো কা'ণে তোলেনি। প্রজার দল যে ভয়ানক অসন্তুষ্ট, আশপাশের গ্রামে যে রঘুনন্দনের ভয়ানক কুখ্যাতি, একথা প্রতিদিনই সে জানতে পেরে যন্ত্রণা বোধ করছিল। একদিন তা'রা জমিদারের বিরুদ্ধে বিপ্লব বাধিয়ে না তোলে এই ছিল ভয়।

এই ভয়, উদ্বেগ, অশ্রদ্ধা আর নিস্পৃহার ভিতরে দিয়ে সমীরের জীবনের আরও কয়েকমাস কেটে গেল। বিহারের দুরন্ত গরমে আর রোদে জল, জলাশয় সব তা'র চোখের সামনে শুকিয়ে এলো। তারপর আবার একদিন বর্ষা নামলো। বর্ষায় আর মেঘে ভ'রে গেল মাঠ আর আকাশ। সেই বর্ষার পর এলো শরৎকাল। শরতের পর হেমন্ত।

হেমন্তের ভোরের দিকে একদিন সমীর তা'র নতুন ঘোড়াটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। জমিদারের অত্যাচার যেন বেড়েই চলেছে। সুতরাং প্রত্যেকদিনের প্রায় সমস্তদিনই সে বাইরে বাইরে থাকে। এখানে থাকার উৎসাহ যেন তা'র অনেকটা ক'মে গেছে। কিন্তু এখান থেকে সে যাবে কোথায়,

সে ভাবনাও তা'র ছিল। এই খানেই সে চিরকাল জীবন যাপন করবে, অথবা এই অবধি এসে তা'র জীবনের গতি ফুরিয়ে গেল—একথা সে কিছুতেই ভাবতে পারে না। মেজর সিংকে খুঁজে বের করতে না পারলে তা'র জীবনে কিছুতেই যেন স্বস্তি নেই। তাঁর ঠিকানাটা আজও আছে সমীরের কাছে। সেই অদ্ভুত আশ্চর্য্য লোকটা তা'কে ঘর ছাড়িয়ে পথে নামিয়ে এনেছে ; তা'র কাণে মূলমন্ত্র দিয়ে গেছে।

এই কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে মধ্যাহ্নের দিকে সে রাঙ্গাগাঁয়ের দিকে ফিরছিল। কোনো এক গ্রামের পথের ভিতর দিয়ে পার হবার সময় আচম্বিতে হঠাৎ একখানা বড় পাথরের টুকরো সজোরে ছুটে এসে তা'র পিঠের শিরদাঁড়ার উপর আঘাত করলো। ঘোড়ার উপরে ছিল সে, সহসা ভীষণ বেদনায় মুখ নীল ক'রে দম আটকে ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে গড়িয়ে সে পথের উপরে প'ড়ে গেল। গ্রামের ভিতরে একটা হৈ চৈ উঠলো। পাথর ছুড়ে কে তাকে এমন ক'রে মেরেছে জানা গেল না ; কিন্তু দেখতে দেখতে কয়েকজন লোক ছুটে এসে আহত সমীরকে উঠতে না দিয়েই তা'র ওপর মারপিঠ চালাতে লাগলো। শক্তি সমীরের গায়ে কম ছিল না, অন্তত একটাকেও সে জখম করতে পারতো,—কিন্তু সে যেন রহস্যজনক ভাবে মুখ বুজে প্রহার সহ্য করতে লাগলো। দেখতে দেখতে কপাল বেয়ে

তা'র রক্তের ধারা গড়িয়ে এলো, এবং ভীষণ প্রহার সহ্য করতে করতে একসময়ে সে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল।

ঘোড়াটা সেখানে ছিল না। কয়েকটা লোক চারিদিক থেকে তা'কে আক্রমণ ক'রে এমন ভাবে তাড়া করলো, যে, ঘোড়াটা ল্যাজ তুলে মাঠের উপর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে একসময়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘটনাটা রাঙ্গাগাঁও থেকে বেশী দূরে ঘটেনি। খবর পৌঁছতে দেরী হলেও সন্ধ্যা লাগাৎ রাঙ্গাগাঁওয়ে এই খবর পাওয়া গেল। সম্ভবত কোনো দফাদার কিম্বা চৌকিদার কি ভাবে না জানি এই ঘটনার কথাটা পৌঁছে দিয়ে আসে। রঘুনন্দনের কাণেও খবরটা উঠলো।

সমীর তা'র নিজের লোক, তা'র কাছে প্রতিপালিত, তারই প্রতিনিধি। সুতরাং তা'কে মারপিঠ করার অর্থ, রঘুনন্দকেই অপমান করা। তা ছাড়া সমীর এখনও ফিরে আসেনি। কেউ বলছে তা'কে খুন ক'রে এখান থেকে দূরে তড়াই নদীর জলে তা'র লাস ভাসিয়ে দেওয়া হেয়েছে। কেউ বলছে, মাটিতে পুঁতে ফেলেছে। কেউ বলছে, বন্দী! এই প্রকার জনরবে দেখতে দেখতে রাঙ্গাগাঁওয়ে আগুন জ্বলে উঠলো। কোন্ গ্রামে ঘটনাটা ঘটেছে, নির্দ্দিষ্ট কেউই বলতে পারে না। এক একজন এক এক গ্রামের নাম করে। কিন্তু যে যাই বলুক, বঘুনন্দন প্রসাদ হুকুম দিলে, আশপাশের সমস্ত

গ্রাম খুঁজে তচনচ করো। যত টাকা লাগে, যত লোক লাগে, আমি দেবো। গোসাঁইকে খুঁজে না বের করতে পারলে গ্রামে গ্রামে আগুন ধরাবো।—বলতে বলতে সিংহের মতো সে ক্রুদ্ধ হয়ে পায়চারি করতে লাগলো।

সেই সন্ধ্যায়ই চারিদিকে লোকজন ছুটলো। কিন্তু কোথায় সমীর ? তা'র কোনো খোঁজ নেই। সে বেঁচে আছে কিনা, কেউ বলতে পারে না।

ছয়

সমীরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না. এই খবর দেখতে দেখতে মহকুমার পুলিশের বড় দারোগার কাণে উঠলো। একটি তরুণ বাঙালী যুবক, রঘুনন্দন প্রসাদের আশ্রিত, একজন ভালো শিকারী আর দুঃসাহসী—এ হেন সমীর হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল, এর একটা কূল-কিনারা না করতে পারলে পুলিশের দুর্নাম বৈ কি। সুতরাং পুলিশ ফৌজ আর গোয়েন্দা তদ্বির-তদারক করতে লাগলো।

রঘুনন্দনপ্রসাদ তার আশ্রিত ও পালিত সমীরের খোঁজ না পেয়ে উন্মত্ত ক্রোধে আশপাশের গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা পুলিশের হাতে পড়ার দরুণ তাকে থামতে হোলো। বাস্তবিক, যত বড় প্রতাপশালী জমীদারই সে হোক না কেন, গ্রামে গ্রামে সে আগুন জ্বালিয়ে নিরপরাধ গ্রামবাসীদের সর্ব্বনাশ করবে, এই বা কেমন ক'রে সম্ভব ? বিশেষ ক'রে পুলিশের হস্তক্ষেপের ফলে তা'র নিজের যথেচ্ছ বিধি-বিধান ত আর চলতে পারে না।

গ্রামে গ্রামে পুলিশের লোক এসে পৌঁছে গেল। একজন জলজ্যান্ত যুবককে সবাই মিলে হত্যা করলো, কিম্বা নদীতে ভাসিয়ে দিল, কিম্বা মাটিতে পুঁতে ফেললো অথচ

সমস্ত ঘটনার কোনো একটা কিনারা করা গেল না, এটা শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের একটা অপযশ বৈ কি। অপরাধের চিহ্ন নেই, অপরাধীর খোঁজ নেই, এবং নিহত ব্যক্তিও যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে, এই প্রকার অদ্ভুত ঘটনা এ প্রদেশে এর আগে আর ঘটেনি। পুলিশের লোক হতভম্ব বনে গেল।

অবশেষে প্রায় মাসখানেক পরে হঠাৎ দূরের এক গ্রামে কে যেন একটা সংবাদ পেলে, সমীরের খোঁজ পাওয়া যায়নি বটে, তবে একথা জানা গেছে, কয়েকজন লোক সমীরকে মুখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে চণ্ডকালীর জঙ্গলে কোন্ এক নালার ধারে বেঁধে রেখে এসেছিল, তারপর এক মানুষ-খেগো বাঘ তাকে মেরে নিয়ে যায়। একজন জংলী তা'র চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে। অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

জমীদারের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রামবাসীরা এই ভাবে নিল। একটি নিরপরাধ বাঙালী যুবক প্রাণ দিয়ে রঘুনন্দনের অন্যায়ের মূল্য শোধ ক'রে গেল। সংবাদটি শুনে পাষাণ-হৃদয় রঘুনন্দন স্তব্ধভাবে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইলো। পুলিশের দল অবশ্য চণ্ডকালী জঙ্গলের আনাচে-কানাচে একবার ঘুরে এসে তদ্বির, তদারক ও তদন্ত চালাতে লাগলো। অপরাধীকে খুঁজে বের করতে না পারলে তাদের পক্ষে অখ্যাতি বৈ কি।

ঘটনাটা অবশ্য আনুপূর্ব্বিক সবই সত্য। তবু এর পিছনে

কাহিনী যেটুকু আছে তা বলা দরকার। ঘোড়ায় চ'ড়ে সমীর যখন যাচ্ছিল সেই সময় পিছন থেকে গ্রামবাসীরা আচম্বিতে এক-খানা পাথর ছুড়ে সমীরকে মারতেই সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল, তারপর সবাই মিলে তাকে আক্রমণ করলো। অতগুলি লোকের ভীষণ প্রহারে সে যখন অজ্ঞান হয়ে গেল, তখন কয়েকজন লোক তাকে তুলে নিয়ে কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হোলো। গ্রাম থেকে কিছুদূরে ছিল এক জঙ্গল, সেখানে লোকেশ্বর শিবের এক প্রাচীন ভগ্ন মন্দির ছিল। মন্দির ছিল বটে, কিন্তু ভিতরে শিবলিঙ্গ নেই। পুরাকালে মুসলমান আক্রমণের সময় বেগতিক দেখে বাবা লোকেশ্বর নাকি মন্দির ছেড়ে পাশের এক ইঁদারার কোন্ গুহায় লুকিয়েছিলেন। গুহাটা এখনো আছে। সুতরাং সমীরের আক্রমণকারীরা রঘুনন্দনের ভয়ে সমীরকে মুখ বাঁধা অবস্থায় সেইদিন মধ্যাহ্নের দিকে সেই গুহার ভিতরে নামিয়ে রেখে আসে। বলা বাহুল্য, প্রহারের কয়েক ঘণ্টা পরেই সমীরের জ্ঞান হয়। কিন্তু এমন আষ্টেপৃষ্ঠে সে বাঁধা যে, একটুও নড়বার সাধ্য নাই। প্রাচীন ইঁদারার গুহার মধ্যে সে একা, ভিতরে সূচীভেদ্য অন্ধকার, আশপাশে শ্যাওলাপড়া পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সাপ আর গিরগিটির আওয়াজ, ছোট ছোট জন্তু আর সরীসৃপের আনাগোনা,—তারই মধ্যে মুখ বাঁধা অবস্থায় সমীর নিরুপায় হয়ে প'ড়ে রইলো। এই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে বন্দী অবস্থায় রজ্জুবদ্ধ হয়ে মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করা

ছাড়া আর কিছু নেই। সমীর স্থিরভাবে চোখ বুজে প'ড়ে রইলো।

আর কিছু নয়, রঘুনন্দনের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য গ্রামবাসীদের এই চক্রান্ত। সমীর তার প্রিয়, তা'র সহকর্ম্মী, তা'র দক্ষিণ হস্তস্বরূপ,—সুতরাং সমীরকে পৃথিবী থেকে সরাতে না পারলে তাদের শান্তি নেই।

বাইরের গ্রামে গ্রামে যখন রটলো, রঘুনন্দন গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিলে দেবে, অপরাধীদের বা'র ক'রে আগুনে পোড়াবে, চারিদিকে যথেচ্ছাচার ক'রে বেড়াবে, তখন আক্রমণকারীরা স্থির করলো, সমীরকে হাত পা বেঁধে তড়াই নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়াই উচিৎ। অতএব সেইদিনই শেষরাত্রের দিকে একটা মশাল জ্বালিয়ে তা'রা ইঁদারার ভিতর থেকে সমীরকে বা'র ক'রে গুপ্ত পথ ধ'রে নদীর দিকে নিয়ে গেল। সমীর ভান ক'রে স্থির হয়ে রইলো, যেন সে তখনও অচেতন। নদীতে এসে নৌকায় চাপিয়ে মাঝ-দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে হাত বাঁধা আর মুখ বাঁধা অবস্থায় তাকে নামিয়ে দেওয়া হোলো। জীবনের সেই চরম পরীক্ষায় সমীর হঠাৎ একবার জলে ডুবে গেল বটে, কিন্তু অন্ধ-কারে এক মিনিট পরেই সে আবার জলে ভেসে উঠলো। ওরা বুঝতে পারেনি, সমীর চিৎ হয়ে কেবল জলের ভিতরে পা নাড়িয়ে সাঁতার কাটছে। ওরা সন্দেহক্রমে নৌকা নিয়ে আবার তার কাছাকাছি এলো, তারপর একটা কাছিতে ফাঁস লাগিয়ে কেমন

ক'রে যেন সমীরকে লট্‌কে তারা জলের উপর দিয়ে টানতে টানতে ওপারে নিয়ে গেল। আট দশ জন লোক, এতগুলি লোকের সঙ্গে সে কিছুতেই পেরে উঠবে না। দুইটা হাত তা'র বাঁধা, মুখ বাঁধা, কোমরে দড়ি, ক্ষতবিক্ষত শরীর, উপবাসে কাতর,—সুতরাং মুখ বুজে তাকে সব অত্যাচার সহ্য করতে হোলো।

তার অচেতন দেহ তুলে নিয়ে লোকগুলো ওপারের মৈখণ্ডার ভীষণ জঙ্গলে যখন ঢুকলো, তখন পূর্ব্বদিকে অস্পষ্ট ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি এই জঙ্গলে নরখাদক বাঘের উৎপাত চলছিল। ছাগল, গরু, মহিষের বাচ্চা, জংলী-দের একটা ছেলে—এইসব নিয়ে গেছে। সেই জঙ্গলে সবাই মিলে সমীরকে নিয়ে গিয়ে বাঘের আনাগোনার পথে এক নালার ধারে গাছের গোড়ায় বেঁধে রেখে এলো। এবার সমীরের নিশ্চিত মৃত্যু, তার আর রক্ষা নেই। বলা বাহুল্য, লোকগুলি চ'লে যাবার পর থেকে আজ অবধি সমীরের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তারপর জনরব, পুলিশের তদন্ত, সমীরের কঙ্কালের টুক্‌রো খুঁজে পাওয়া, তা'র জামা কাপড়ের চিহ্ন আবিষ্কার।

কিন্তু নরখাদক বাঘের খেয়াল-খুশির ওপর ছেড়ে দিলেই যে সেই বাঘ এই পথে আসবে, এমন কোনো কথা নেই। সে পথে বাঘ এলো না, কিন্তু দেখতে দেখতে ভোরের আলো জঙ্গলের মধ্যে নেমে এলো, পাখী ডেকে উঠলো, অরণ্যের মাথায় রোদ পড়লো।

সমীর আষ্টেপৃষ্ঠে গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার নড়বার সাধ্য নেই। কিন্তু ইতিমধ্যেই গাছের গুঁড়ির সঙ্গে সে হাতের দড়ি ঘসতে সুরু করেছে। পায়ের দড়িও সে ঘসে চলেছে ধারালো পাথরের কিনারায়। নিজের মুক্তি-সাধনায় সারাদিন তার কেটে গেল। তারপর সন্ধ্যার কাছাকাছি হাতের দড়ির একটা ফাঁস সে ছিঁড়তে পারলো। অতি কষ্টে বাঁ হাতখানা তা'র মুক্ত হোলো। তখন তা'র বাঁচবার অদম্য ইচ্ছা জাগলো। কিন্তু সামনে রাত্রি। আজ যে বাঘ আসবে না তা কে বলতে পারে! কাছেই জলের ধারা, এবং এইখানেই এসে বাঘে জল খাবে। সুতরাং প্রাণভয়ে সে প্রাণপণ পরিশ্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টার চেষ্টায় আর একটি হাত ছাড়াতে পারলে। কী যে আনন্দ, আর কী যে আশঙ্কা, তা'র সীমা নেই; দুখানা হাত ছাড়াবার পর শরীরের বাঁধন খুলতে তা'র অনেকক্ষণ লাগলো। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, বেদনায় সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট, ক্ষুৎপিপাসায় দেহ মন জর্জর,—শরীরের বাঁধন খুলে অনেকক্ষণ সে হাঁপাতে লাগলো। সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ, অরণ্যে অন্ধকার, শীতের তীব্র বাতাস, আর প্রবল ঠাণ্ডা,—কিন্তু এই অরণ্য থেকে আজকে বেরোবার চেষ্টা মানে অবধারিত মৃত্যু। বন-শূয়োর, চিতা, ময়াল সাপ আর সরীসৃপ, হিংস্র পোকা-মাকড়, বড় বড় পিঁপড়ে আর ডাঁশ,—এদের হাত থেকে তা'র নিস্তার নেই। অতএব রাত্রিবাস এখানে করতেই হবে। অনেক ভেবে চিন্তে কাছাকাছি বড় একটা গাছে কোনো-

মতে উঠে সমীর একটা ডালে শরীরটা হেলান দিয়ে ক্লান্তভাবে ব'সে রইলো। চারিদিকের বীভৎস অন্ধকারে নির্জন অরণ্যের আতঙ্ক তাকে যেন রাহুর মতো ধীরে ধীরে গ্রাস করছে।

পরদিন সকালে শীতে আড়ষ্ট শরীরে অত্যন্ত সাবধানে সে গাছ থেকে নেমে এলো। উপরের দিকে রোদ উঠলেও জঙ্গলের নীচে তেমনি তুহিন আবছায়া। তবু সমীর নেমে অতি সন্তর্পণে উৎকর্ণ হয়ে পথ হাতড়ে হাতড়ে চললো। তার পরণের কাপড়-জামা ছিন্নভিন্ন, অপরিচ্ছন্ন। তার মাথার চুলের রাশি এলোমেলো, মুখখানা ক্ষতবিক্ষত, চোখ দুটো তীব্র—সে যেন কবরের মাটির তলা থেকে উঠে এসেছে। অরণ্যে পথ কোথাও নেই, দিক্‌চিহ্ন দুর্বোধ্য, সূর্য্যের একটু আলো আকাশে দেখা গেলেও পূর্ব্বদিক চেনা যায় না—সুতরাং এই অরণ্যে তা'র চির নির্বাসন। বন্ধন থেকে মুক্তি পেলেও, শত্রুর হাত থেকে ছাড়া পেলেও মৃত্যু তা'র হয়ত নিশ্চিত। কিন্তু তবুও আজকের ক্ষুধা তার প্রচণ্ড। কোনো একটা গাছের ফল, কিছু একটা খাদ্য,—এ নৈলে কিছুতেই সে আর থাকতে পারছে না। অসহ্য ক্ষুধা চাপতে চাপতে তার যেন কেমন একটা বমি বমি ভাব এসেছে। সুতরাং এখন সকালবেলা বাঘ অথবা ভালুকের ভয় অপেক্ষা ক্ষুধার যন্ত্রণা তার কাছে অনেক বড়। বালু-পাথরের উঁচুনীচু ডাঙ্গা পেরিয়ে আর ঝোপঝাড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একদিকে পাগলের মতো সমীর চলতে লাগলো।

কতক্ষণ কত ঘণ্টা সে চললো তার ঠিক নেই, কত দূরে এসে পৌঁছল তাও অজানা, কিন্তু মধ্যাহ্নের কাছাকাছি একটি ক্ষুদ্র জলের ধারার কাছে সে এসে বসলো। এক অঞ্জলি জল নিয়ে সে মুখে দিল। তারপর সে কাৎ হয়ে রইলো। অর্দ্ধ অচেতন, নিদ্রালু, হতাশাগ্রস্ত, সে আর কোথাও আশার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে না। এখান থেকে গলার আওয়াজ করলে, কাঁদলে, চীৎকার করলে—কেউ শুনবে না। তার মৃতদেহ যদি এখানে প'ড়ে থাকে, কেউ কোনোদিন খোঁজ করবে না। সমীরের অবসন্ন দুই চক্ষু অপরিসীম ক্লান্তিতে বুজে এলো।

ঘণ্টাখানেক,—তারপরই সহসা সে উঠে দাঁড়ালো। সূর্য্যের গতিপথ এবার সে বুঝতে পেরেছে। শীতের সূর্য্য পশ্চিম দিকে হেলেছে। বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। সে পশ্চিম পথ ধরেই এবার হাঁটবে, সেদিকে আলো বেশী। যদি খাবার মতো একটা ফল পাওয়া যেতো! কিন্তু শীতের দিনে ফল কোথায়? সুতরাং বিশ্রামের পর সমীর আবার পূর্ণ উদ্যমে টলতে টলতে চলতে লাগলো।

কিন্তু শীতের সূর্য্য পশ্চিমদিকে নামলে বেলা আর কতটুকু বাকি থাকে? অরণ্যে অন্ধকারের ভাগটাই বড়, তারপর এখনকার বেলা ছোট। সমীর পিছন দিকে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে একবার তাকালো। পশ্চিমের সূর্য্য বেশী দূর অরণ্যের ভিতর পৌঁছতে পারছে না। বাঁ দিকে একটা ছোট পাহাড়, দেয়ালের

মতো—তারই ওপারে দিনের আলো এরই মধ্যে অবসন্ন। এখন তা'র হাতে অস্ত্র নেই, গাছে উঠবার মতো শক্তি নেই, এখন যদি কোনোদিক থেকে অতর্কিতে একটা জানোয়ার এসে তা'র উপর লাফিয়ে পড়ে তবে আত্মরক্ষা করবার কোনো উপায়ই থাকবে না। একদিন যে অরণ্যকে সে শাসন করেছে, সেই অরণ্য আজ চারি-দিক থেকে অবরোধ ক'রে তাকে মারবে।

আঁা—আঁা—আঁা! হঠাৎ একটা আওয়াজে সমীর চমকে উঠলো। একটা অদ্ভুত অপরিচিত আওয়াজ। বুকের ভিতর তার ঢিপঢিপ করতে লাগলো। এ কোন্ জানোয়ার? কোন দিক থেকে তাড়া ক'রে আসছে? সমীর একটা গাছের গুঁড়ি ধ'রে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু আবার সব চুপ। কেবল কোথায় যেন দূরে গাছের ডাল ভাঙার একটা শব্দ পাওয়া গেল। মড় মড় ক'রে গাছ ভাঙছে। হয়ত ভালুক হতে পারে, কিম্বা কোনো বড় হরিণ!

আঁা—আঁা—আঁা!

চকিত সমীর এদিক ওদিক তাকালো। এবার আও-য়াজটা অতি নিকটে। ঘন অরণ্যে চারিদিক সাঁ সাঁ করছে। নীচের দিকে কেবল বনফুল আর আস-শ্যাওড়ার ঝোঁপ। তাদেরই পাশ থেকে এই অদ্ভুত প্রাণীর কণ্ঠস্বর। শকুনি নয়, হায়না নয়, সম্ভর নয়, বন-কুকুর কিম্বা বন-মুরগী নয়—এ এক বিচিত্র আওয়াজ পৃথিবীর কোনো জানোয়ারের সঙ্গেই মেলে না।

আবার দূরে গাছ ভাঙার মড়-মড় শব্দ।

সমীর সহসা তার অবস্থাটা অনুভব ক'রে নিল। কোনোদিক থেকেই তা'র উপর আক্রমণ আসছে না। এদিকে ওদিকে একবার উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে সে আবার কয়েক পা অগ্রসর হোলো। একটা ঝোপের পাশ দিয়ে পেরোতেই এবার হঠাৎ বাঁকের দিকে তার চোখ পড়লো। কিন্তু যে দৃশ্য সে দেখলো, তা'তে সে স্তম্ভিত হয়ে রইলো।

একটি ছোট্ট উলঙ্গ শিশু কুৎকুৎ ক'রে তা'র দিকে চেয়ে রয়েছে। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে শিশুর গায়ে। উলঙ্গ অপরিচ্ছন্ন হতচকিত শিশু একটা গাছের ডাল আর কয়েকটা পাতা নিয়ে খেলায় মেতে রয়েছে। তা'র চোখে বিপদ ও মৃত্যুর ভয় লেশ মাত্র নেই। কোথা থেকে এই শিশু এলো, কে আনলে,—সমস্তটাই যেন রহস্যময়! কিন্তু তা'কে দেখে অপরিসীম আনন্দ আর স্বস্তিতে সমীরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। শিশুটি যেন তা'র মৃত্যুর দুয়ারে নবজীবনের আশা ও আশ্বাস এনেছে।

সাত
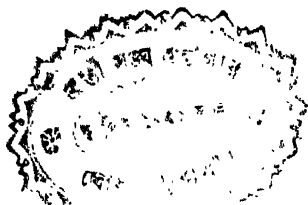
শীতের অপরাহ্ণ, সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা। কিন্তু সেদিকে সমীরের আর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। নির্জন অরণ্যের মাঝখানে এই বিচিত্র মানবশিশুর দিকে তাকিয়ে কতক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার জীবনের নাটকে এ যেন এক অভিনব দৃশ্য।

কতক্ষণ, মনে নেই, সহসা মানুষের গলার আওয়াজে তার চমক ভাঙলো। মুখ ফিরিয়ে দেখলো, প্রকাণ্ড কাঠের বোঝা পিঠে নিয়ে একটা লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটির পাশে পাশে আর একজন স্ত্রীলোক। এই শিশু যে ওদেরই তা'তে আর সমীরের সন্দেহ রইল না।

পাছে তা'কে দেখে ওরা ভয় পায়, এজন্য সমীর নিজেই সাড়া দিল। তা'র কণ্ঠ বড় ক্ষীণ ও দুর্বল, তবু নিজেই সে এগিয়ে বললে, সর্দার, এখানে শিশু রেখে গেছ, ভয় করে না?

স্ত্রী-পুরুষ দুজনে কাছে এল। সমীরের আপাদমস্তক তাকিয়ে তাদের জংলী হিন্দী ভাষায় বললে, তুমি কে বটে?

সমীর তাদের ভাষা বেশ ভালো জানতো। বললে, আমি ভাই দেহাতি। সাহেবদের সঙ্গে জঙ্গলে এসেছিলাম শিকার

খেলায়, তারপর পথ হারিয়ে গেছি। আজ ভাই দুদিন হোলো।

তা'র শরীরের দুরবস্থা দেখে দুঃখপ্রকাশ ক'রে স্বামী-স্ত্রী দুজনে বললে, দুদিন জঙ্গলে রয়েছ? ভারি তখ্‌লিপ হয়েছে ত?

সমীর বললে, হ্যাঁ, আমি পথ খুঁজে পাইনি। খাবারও কিছু জোটেনি দুদিন। কোথায় থাকবো তাও জানিনে।

স্ত্রীলোকটি তা'র ছেলেকে কোলে তুলে নিল। সমীর হাসিমুখে বললে, ছেলেকে এখানে রেখে গিয়েছিলে, ভয় করেনি?

সে বললে, না, ভয় কি? এদিকে এখন জান্‌বর নেই।

লোকটি বললে, আমাদের ডেরায় তুমি যাবে?

সমীর বললে, তোমার দয়া—যদি আমাকে থাকতে দাও।

তারা রাজী হয়ে বললে, আচ্ছা চলো।

জঙ্গলের সীমানায় সমীর হাতড়ে হাতড়ে এসে পৌঁছেছিল, আগে সে বুঝতে পারেনি। ঝোপঝাড়ের আকাবাঁকা পথ পেরিয়ে দেখতে দেখতে তা'রা গ্রাম্যপথের বাঁকে এসে পৌঁছল। তখন সন্ধ্যা, শীতের সূর্য্য অস্তে নেমেছে। জঙ্গলে ঝিল্লিরব জেগে উঠেছে।

আশা আনন্দে সমীরের ক্লিষ্ট ক্লান্ত জীবন আবার দুলে উঠলো। দৈবক্রমে শিশুটিকে দেখতে না পেলে তা'র মৃত্যু

ছিল নিশ্চিত। কিন্তু মৃত্যু তা'র হোল না—নিশ্চয় তা'র জীবনে আরো কোনো বৃহত্তর সম্ভাবনা আছে। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়, ভাগ্যের বিবর্ত্তনে, সে পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে। মেজর সিংয়ের সন্ধানে সে একদিন দেশত্যাগ করেছিল। কিন্তু সেই লক্ষ্য তা'র ভাগ্যের বিড়ম্বনায় কোথায় হারিয়ে গেছে। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা, অথবা এই অবস্থার চক্রান্ত পেরিয়ে সে লক্ষ্যপথে যেতে পারবে কিনা, একথা আজকে আর বলা কঠিন। কিন্তু সেই লোকটার মন্ত্র কানে তোলার পর থেকেই সে কেবল বিপদ আর দুর্য্যোগ পেরিয়ে চলেছে। মেজর সিং তা'র জীবনের গুরু।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের চিহ্ন কিছু দেখা গেল না। কেবল এক আধটা টিমটিমে আলো কোথাও কোথাও তা'র চোখে পড়লো। অবশেষে এক সময় একটা ঝোপের কিনারা পেরিয়ে এক চালাঘরের কাছে এসে সবাই দাঁড়ালো। চালাটা বেশ বড়। মনে হেলো, আশপাশে অনেক লোকের চাপা কথাবার্ত্তা চলেছে। কিন্তু শীতের সন্ধ্যায় এরই মধ্যে ঝাঁপগুলো সব বন্ধ।

মাঝখানে সমীর একবার জিজ্ঞেস করলে, তোমার নামটি জানতে পারিনি, ভাই ?

লোকটি বললে, আমার নাম মঙ্গু।—এই ব'লে তারা দুজনেই শিশুটিকে নিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো।

অত্যন্ত গরীব ওরা। এত গরীব যে ওদের কাছে এক রাত্রের আতিথ্য নিতেও লজ্জা করে। ভিতরে দু'একখানা ছেঁড়া কাপড়ের টুকুরো, মাটির দু তিনটে হাঁড়ি, একখানা চাটাই—ওপাশে অতি দরিদ্র রান্নার আয়োজন। এরাই প্রকৃত দেশের লোক, কিন্তু এই হতভাগ্যরা যে এত দরিদ্র, এই দৃশ্য দেখে আজ প্রথম সমীরের মাথা হেঁট হয়ে এলো। একথা বেশ বুঝতে পারলো, এখানে তা'র দীর্ঘকাল থাকা কিছুতেই চলবে না। তা'কে আবার নিরুদ্দেশ হ'তে হবে।

মঙ্গুর বউ আলো জ্বাললো। মঙ্গু এসে সমীরকে ভিতরের আর একখানা ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সুড়ঙ্গের মতো সেই খাপরায় আলোর আভাস যেতে পারলো না। তা'র ভিতরে পোকামাকড়, সাপ-বিছা যা কিছুই থাকতে পারে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার মতো শরীরের অবস্থা সমীরের ছিল না। ছেঁড়া চাটাই আর খড়ের সাহায্যে বিছানা ক'রে সে শ্রান্ত হয়ে ব'সে পড়লো। মঙ্গু নিজেই ডাল রুটি বানাবার আয়োজনে লেগে গেল।

চ'লে যাবার চেষ্টা থাকলেও দিন দুই অনড় বিশ্রামের মধ্যে সে প'ড়ে রইল। তা'র যেন উত্থানশক্তি ছিল না। মঙ্গু নিজে জংলী হ'লেও তা'র ছেলেটা কিছু ভদ্র। ছেলেটার সঙ্গে সমীর সারাদিন খেলায় মেতে রইল। কেবল তাই নয়, মঙ্গুর স্ত্রীর সঙ্গে সে শাক-রুটি তৈরীর

কাজেও লাগলো। ওদের কাছ থেকে স্নেহ আদায় করতে তা'র দেরী হোলো না।

আশপাশের সবগুলিই জংলী গ্রাম। কানাকানিতে বুঝতে পারা গেল, এদিককার কয়েকটি মৌজা রঘুনন্দনেরই অধিকারে। কিন্তু এ অঞ্চলের লোকেরা জমীদারকে জানেনা। জানে কেবল তাদেরই, যারা খাজনা আদায় করতে আসে। তারা অত্যাচার অনাচার ক'রে টাকাকড়ি জিনিসপত্র নিয়ে যায়, এইটুকুই কেবল গরীব লোকেরা জানে। সমীর নিজের পরিচয় গোপন রেখে খুব সন্তর্পণে রইলো। এ গ্রামে সে নতুন, সে কোথাকার একজন গরীব দেহাতি, এদিকে এসেছে ক্ষেতমজুরির কাজে, এই কথাই এখানে ওখানে রটনা হয়ে গেল। রটনা হওয়ার ফলে কপালক্রমে তার কাজও একটা জুটলো। এখন ফসল কাটার সময়, তরীতরকারীর মরশুম, এরপর রবিশস্যের ঋতু—সুতরাং তা'র সামান্য মজুরির অভাব হোল না। পাছে কোনপ্রকারে কেউ এসে তা'কে চিনতে পারে, এজন্য এখানকার সাধারণ চাষীর মতো সে ছোট কাপড় আর মাথায় পাগড়ী পরলো। দেখতে দেখতে বহুলোকের সঙ্গে দিন পনেরোর মধ্যেই সে চমৎকার বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিল। সে নিজে খেতে পায়, এই যথেষ্ট। এ ছাড়া বাকি মজুরির পয়সায় সে অন্য মজুরদের তামাক, বাদাম, মাক্কাই প্রভৃতি জুগিয়ে তাদের বশীভূত করলো। সরল মজুর আর চাষীরা সমীরের কোনো মতলবই বুঝতে পারলো না।

এমনি ক'রে মাস তিনেক কেটে গেল। চতুর্থ মাসে দেখা গেল, সমীর ছোট একটি চালাঘর বানিয়েছে। এক খণ্ড জমিও সে দখল করেছে। দুটা বলদ, হাল-লাঙ্গল, এবং দুটা লোককে সে মোতায়েন করেছে। নিজের জমিতে ছোট ছোট চাষও লাগিয়েছে। কেবল তাই নয়, পাশের জমীর মালিকের কাছ থেকে সে চাউল, গম, মটর, সরষে ইত্যাদি ধার নিয়ে এ অঞ্চলের কোন্ হাটে বিক্রি ক'রে বেশ দু'পয়সা লাভ এনেছে। সেই লাভের পয়সা সে নিজে নিল না, এখানকার কয়েকটি জমির খাজনা বাবদ সে প্রতিবেশীদের হাতে তুলে দিল। এর ফলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে তা'রা নিজ নিজ জমিতে সমীরকে চাষ করার অধিকার দিল। দুধ, মাখন পাঠালো এবং বলদ দুটার জন্য ঘাস সরবরাহ করলো। সমীরের অন্নসমস্যা আর আশ্রয় সমস্যা ঘুচলো। চৈত্রমাসের মাঝামাঝি মঙ্গুর স্ত্রীর জন্য রূপার পৈছা আর শিশুর জন্য পুতুল কিনে একদিন সে দূরের হাট থেকে ফিরে এলো।

এমনি ক'রে আরো দু'মাস কেটে গেল। গ্রীষ্মকালের মাঠঘাট তখন প্রখর সূর্য্যের কিরণে চারিদিকে দপদপ করছে।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই সমীর যে কিরূপ আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠালাভ করলো, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ভাগ্য তার প্রতি কখনো হাসছে, কখনো বা বিদ্রূপ করছে। কিন্তু ভাগ্যের এই পরিবর্ত্তন যত বিচিত্রই হোক, সে ঠিকই

এগিয়ে চলেছে। কোথাও সে থেমে নেই। রঘুনন্দনের জমীদারীর সংস্পর্শে থেকে এই অল্প বয়সে সে যে শিক্ষালাভ করেছে, এখানে সেই শিক্ষা সে কাজে খাটাতে পারলো, এজন্য মনে মনে নিশ্চয়ই সে রঘুনন্দনের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু কৃতজ্ঞ হলেও বলবানের নিষ্ঠুরতাকে সে ক্ষমা করতে পারবে না। যার শক্তি আর সম্পদ্ আছে, সে লোভের বশীভূত হবে কেন? পরের জন্য স্বার্থ ত্যাগ কেনই বা সে করবে না? কেনই বা তা'র সংযম থাকবে না? সুতরাং রঘুনন্দন তা'কে যত বড় দুর্দিনেই কেন না আশ্রয় দিয়ে থাকুক, সে সমীরের বন্ধু নয়। বরং যারা তাকে হত্যার ষড়্যন্ত্র করেছিল, যারা তা'কে হাত পা বেঁধে জঙ্গলে রেখে গেছে, তাদের অপরাধ কম। তারা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করেনি, অনাচারের প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিল মাত্র। তা'রা গরীব, তা'রা মূঢ়, তা'রা প্রতিশোধপিপাসী, কিন্তু তা'রা বলদর্পী নিষ্ঠুর নয়। অতএব সমীর অনেক আগে থেকেই স্থির করেছে, এই অঞ্চলে সে থাকবে, শক্তি সঞ্চয় করবে, এদের সকলকে মানুষ ক'রে তুলবে—যাতে একদিন এদের সকলের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে থেকে সে রঘুনন্দনের আসুরিক শক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে! কিন্তু সেই শুভ দিনটি কি তা'র জীবনে সম্ভব?

কিন্তু হঠাৎ সেই সম্ভাবনা একদা অতর্কিতভাবে তা'র সামনে এসে হাজির হোলো। বৈশাখ উত্তীর্ণ হ'তে চলেছে।

আগামী বর্ষার আগে বীজ বপনের পালা। এগাঁয়ে ওগাঁয়ে জমিদারের লোক এসে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে দাদন দেওয়া চলছে। চাষারা এক হাতে দাদন নিচ্ছে অন্য হাতে শোধ করছে জের পড়া খাজনা, কিম্বা পুরনো টাকার সুদ। কোথাও বা বকাবকি। শিউগঞ্জের লোকেরা রব তুলে দিল, তা'রা দাদন নেবে না, তাদের বীজ কেনা আছে। কিন্তু ঋণ ও সুদের প্রশ্ন যখন উঠলো, তখন তা'রা জবাব দিল, নতুন ফসল তোলার সময় সে-চেষ্টা করা যাবে। বাকি খাজনা মকুব করতে হবে, কারণ চাষীদের অবস্থা ভালো নয়।

এটা স্পর্দ্ধার কথা সন্দেহ নেই। গরীবের এত বড় দম্ভ যে, তা'রা দারিদ্র্যের অছিলায় জমিদারকে ফাঁকি দিতে চায় ? এত বড় শয়তানি যে, খাজনা মকুব করতে বলে ? চাষীরা এসে পায়ে প'ড়ে কাঁদবে, এইজন্যই ত' তাদের জন্ম ! তা'রা কিনা যুক্তি দেখিয়ে দায়িত্ব এড়াতে চায় ? স্পর্দ্ধা বটে !

শিউগঞ্জে অর্থাৎ সমীরদের গ্রামে একটা গণ্ডগোল দেখা দিল। চাষীরা সন্ধ্যার পর এসে সমীরের চালাঘরটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উপদেশ প্রার্থনা করলো। সমীর ঘোষণা ক'রে দিল, ওদের কাছে আমরা কেউ মাথা হেঁট করব না। ওরা কি করে, দেখতে চাই। এই ব'লে সে দু'চারজনকে চুপি চুপি ডেকে কি যেন পরামর্শ দিল। সকলে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো।

কিন্তু বারুদ যখন একত্র হোলো, তখন আগুন জ্বল্‌তে

দেরী হয় না। দিন-দুই পরে কোন্ এক চাষী পরিবারের সঙ্গে জমিদারের লোকের একটা বচসা ঘটে। দু'চারটে গালমন্দ হতেই চাষার একটি পনেরো ষোল বছরের মেয়ে ঘর থেকে একখানা চ্যালাকাঠ নিয়ে বেরিয়ে এসে ওদের একজন গোমস্তার কপালে সজোরে বসিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, লোকটার মাথা ফাটে এবং কপাল বেয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে আসে। মেয়েটা তারপর উন্মাদিনীর মতন চ্যালা কাঠখানা ঘোরাতে ঘোরাতে আরো দু'চারজনকে জখম করে।

তা'র রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখে প্রথমটা সকলেই হতবাক, কেউ স্তম্ভিত। কিন্তু তারপরেই একটা ভীষণ সোরগোল উঠলো। সেদিন হাটের বার থাকার জন্য নানা গ্রাম থেকে লোকজনের আনাগোনা চলছিল—সুতরাং দেখতে দেখতে এখান ওখান থেকে লোকজন মাঠ পেরিয়ে এলো ছুটতে ছুটতে। জমিদারের লোকের সংখ্যা কম নয়, তাদের সমর্থকও অনেক। দুজন লোক এগিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে মেরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

খবরদার, মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়ো না—এমনি একটা রব তুলে সেই দরিদ্র, অর্দ্ধনগ্ন চাষার দল সবাই মিলে এগিয়ে এলো। দেখতে দেখতে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল। চারিদিকে মার মার শব্দ উঠলো। গ্রামসুদ্ধ হৈ হৈ রৈ রৈ চলতে লাগলো।

ঘণ্টাখানেক এই প্রকার মারপিঠ চলছে, এমন সময়

কয়েকটা লোক বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে সহসা চাষার চালাঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিল। গ্রীষ্মকালে একেই ত চারিদিক শুষ্ক, আতপ্ত,—তার ওপরে সন্ধ্যার বাতাসে আগুন দেখতে দেখতেই আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়লো। পাঁচখানা চালাঘর দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। চারিদিকে আর্ত্তনাদ, হাহাকার আর সামাল সামাল রব।

সেই আগুনের আলো নিষ্প্রভ হবার আগেই জমিদারের লোকেরা চাষার দলকে আক্রমণ ক'রে বেদম প্রহার করতে লাগলো। যারা গরীব, যারা খেতে পায় না, যাদের সহায় সম্বল নেই—তারা প্রবলের উৎপীড়নের তলায় পড়ে কেবল কাতরাতেই লাগলো, কিন্তু প্রতিশোধ নিতে পারলোনা। তা'রা মার খেলে কেবল ঈশ্বরকেই ডাকতে জানে, কিন্তু এ কথা বোঝে না, দুর্ব্বলকে ভগবানও রক্ষা করতে পারে না। সুতরাং যারা প্রতিকার করতে শেখেনি, তা'রা কেবল কাঁদতেই পারে, কেবল মার খেয়ে খেয়ে মরতেই পারে মুখ বুজে, এতে আর আশ্চর্য্য কি ?. ঠিক তেমনি এখানেও ঘটলো। শিউগঞ্জের জনসাধারণ মার খেড়ে অসাড় হয়ে এলো।

এমন সময় আবার একটা সোরগোল উঠলো, রতন সর্দ্দারের মেয়ে লছমীকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটাকে সেই যে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে, বোধ হয় জমিদারের একদল লোক তা'র মুখ বেঁধে নিয়ে পালাচ্ছে নদী

পেরিয়ে। সংবাদ পাওয়া মাত্র লোকেরা এদিক ওদিকে অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে লাগলো। কিন্তু তার সন্ধান পাবার আর কোনো উপায় ছিল না। এদিকে শিউগঞ্জে আগুন জ্বলছে, রতনের ঘর পুড়ছে, লোকজন কাতারাচ্ছে, কা'রো কা'রো গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লেগে তারা ছটফট করছে। অনেক লোকে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েও গেছে।

ওদিকে নদী পেরিয়ে জমিদারের পেয়াদা, পাইক আর গুণ্ডার দল চলে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে লুঠকরা জিনিসপত্র, আর দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় লছমী ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদছে। চ্যালাকাঠ মেরে লছমী যার মাথা ফাটিয়েছিল, সেই লোকটার সঙ্গে আরো চারজন মিলে লছমীকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে ! সামনে একটা শালের জঙ্গল পেরিয়ে গেলেই আখের ক্ষেত, তারপরে মাঠ। মাঠ পেরোলে রঘুনন্দনের এলাকাভুক্ত গ্রাম।

সহসা শালের জঙ্গলের ভিতর থেকে রে রে রে রে শব্দে বেরিয়ে এলো প্রকাণ্ড একদল জংলী। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় তাদের চেনবার উপায় নেই। তারা যেন সবাই যমদূতের মতো জমিদারের গুণ্ডাদলের ওপর এসে আক্রমণ আরম্ভ করলো। অমনি 'মার মার শব্দ'। কী ভীষণ প্রহার, জমিদারের দলে ছিল জন তিরিশ, তারা একশোর ওপর। গাছের ডাল, লাঠি, পাথরের টুকরো—যার সঙ্গে যা ছিল, তাই দিয়ে মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হোলো। জমীদারের লোকদের আর পালাবার কোনো

পথ নেই, চারিদিক থেকে তাদের অবরোধ ক'রে মারতে মারতে জংলীরা একেবারে ধরাশায়ী ক'রে দিল। তাদের চীৎকার আর আর্ত্তনাদ জঙ্গল পেরিয়ে আর কোথাও শোনা গেল না।

ঠিক সেই সময় একজন কৃষ্ণকায় জংলী লছমীর কাছে এসে তার কোমরের দড়ি খুলে দিয়ে জংলীভাষায় বললে, শীঘ্র পালিয়ে এসো আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে তোমার মা বাবার কাছে পৌঁছে দেবো। কেঁদোনা, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

লছমীর হাত ধ'রে জংলীটি ছুটতে ছুটতে এসে নদীতে নেমে নৌকায় উঠে দড়ি খুলে দিল। তারপর বললে, ভয় কি? আমার সঙ্গীরাও আছে পিছনে পিছনে। আমাকে চিনতে পারছো না বুঝি? মুখে কালো রং মেখে ছিলাম, ওরা যাতে আমাকে চিনতে না পারে। আমি শিউগঞ্জের সমীর সর্দ্দার।

আট

এমন একটা খণ্ড যুদ্ধের সংবাদ পুলিশের কানে গিয়ে উঠতে দেরী হোলো না। সদর থেকে পুলিশের ফৌজ এসে শিউগঞ্জে হানা দিল। গ্রামের চালাঘরগুলি পুড়ে পুড়ে তখন ছাই হয়ে গেছে, গোলা থেকে ধোঁয়া উঠছে,—এখানে ওখানে লুঠের মালগুলি তখনও ছড়ানো। যাদের শরীর পুড়ে গেছে, তাদের আর্ত্তনাদ তখনও থামেনি। দারোগা সকলের এজাহার লিখতে লাগলেন।

নদীর পারে দুটো লোক একেবারে খুন হয়ে গেছে, এবং আর কয়েকজন জখম হয়েছে—কিন্তু কারা অপরাধী, হত্যাকারী কে, কেই বা গ্রামে আগুন দিল, নদীর ওপারে গিয়ে কা'রাই বা জমীদারের লোককে আক্রমণ করেছিল, এই সব তথ্য জানতে গেলে যাদের পাওয়া দরকার, তারা সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। দুটো কথা জানা গেল বটে। প্রথম খাজনা আদায়ের ব্যাপারে গণ্ডগোল, এবং দ্বিতীয় একটা মেয়েকে চুরি করা। এই নিয়ে যুদ্ধ, হত্যা, অগ্নিকাণ্ড। কিন্তু লছমী নেই, রতন সর্দার নেই, জমিদারের লোক নেই। আছে কেবল ভস্মাবশেষ গ্রাম, এবং জনরব। সমীর সর্দার নামক একটা লোকের নাম পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু এ গ্রামে ওগ্রামে তা'র চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। সুতরাং

পুলিশের লোকেরা এ গ্রামে তদন্তের ব্যাপারে কোনো হদিস না পেয়ে জমিদারের গ্রামের দিকে রওনা হোলো।

কিন্তু পুলিশ তদন্তের আগে লোকচক্ষের আড়ালে যে ঘটনাটা ঘটেছিল, সেই কথাটা এখানে বলা দরকার। ঘটনার দিন রাত্রে গ্রামের চৌকিদার শিউগঞ্জে ছিল না। তারপর দিন সন্ধ্যায় সে ফিরেছিল বটে, কিন্তু তাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে রইলো সারারাত। তার পরের দিন সে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে থানায় খবর দেবার জন্য যাত্রা করলো। অর্থাৎ চারদিন লাগলো পুলিশে খবর পৌঁছুতে। ইতিমধ্যে প্রথম দিন রাত্রে নদীর ওপারের জঙ্গলে জমীদারের গুণ্ডাদের হাত থেকে লছমীকে উদ্ধার ক'রে নৌকাযোগে সমীর চুপি চুপি এপারে এলো। তখন গভীর রাত। গ্রামের এক প্রান্তে তখনও আগুন জ্বলছে। এই অবসরে সমীর গোপনে তা'র দলের প্রায় পঞ্চাশজন স্ত্রীপুরুষ এবং লছমীর মা বাবা আর ভাইকে গ্রামের অপর সীমানায় এক আখের ক্ষেতের ধারে একত্র করলো। সে জানে পুলিশে ধরা পড়লে সকল প্রকার তদন্ত আরম্ভ হবে, আর সেই তদন্তে তা'র নিজের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ারও সম্ভাবনা। পরিচয় বেরিয়ে পড়লে তাকে নানা রকমে হায়রাণ হতে হবে। কেবল তাই নয়, তা'র নিজের দেশেও সেই খবর পৌঁছুতে পারে। যাই হোক, সকলকে একত্র ক'রে রেখে সে গিয়ে তা'র সঞ্চিত টাকা কড়ি ইত্যাদি নিয়ে এলো। অন্যরাও তাদের যা কিছু পুঁজি সমীরের হাতে তুলে

দিলে। সমীর যে কেবল তাদের বিশ্বাসী তাই নয়, তাদের ত্রাণ-কর্ত্তাও বটে। এর পরে গম, ডাল, ভুট্টা, কিছু কিছু শবজী, গুড়, ক্ষীর, কিছু কাপড় চোপড় এবং কয়েক পাঁজা কাঠ—এই সব নিয়ে তারা অন্ধকার রাত্রে নৌকাজাত করলো। সবসুদ্ধ পাঁচখানা নৌকা—সবগুলিতেই ছই বাঁধা ছিল। সমীরের নায়কত্বে যাত্রীর দল নিয়ে নৌকা যখন ছাড়লো, রাত্রি তখন শেষ হয়ে এসেছে। ভাটির টানে নৌকাগুলি দ্রুতবেগে ভেসে যেতে লাগলো। নৌকা-গুলিতে দশটি মেয়েছেলে, আর প্রায় চল্লিশজন পুরুষ। সমীর তাদের সবাইকে শিখিয়ে দিল, তারা সবাই তীর্থ করতে চলেছে। তারা তীর্থযাত্রী মাত্র।

বলা বাহুল্য, শিউগঞ্জে পুলিশের তদন্ত যখন আরম্ভ হোলো, তখন সমীরের দল একশো মাইল দূরে চ'লে গেছে। অনেকে তাদের প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে চলেছে, সেজন্য কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সমীর তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, জন্মভূমি প্রিয় সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশ অনেক বড়। আবার নতুন দেশে গিয়ে তোমরা পত্তন করবে। যেখানে অত্যাচার অশান্তি নেই, সেখানেই তোমরা ঘর বাঁধবে। সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে। আমা-দের জন্মভূমি কেবলমাত্র একটি গ্রাম নয়, এই বিশাল ভারতবর্ষ। ওই চেয়ে দেখো গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ, ওই গম আর ভুট্টার ক্ষেত, এই নদী, উপরে ওই আকাশ, দূরে ওই পাহাড় আর বন—এই সমস্ত নিয়ে

তোমাদের জন্মভূমি, তোমাদের মাতৃভূমি। এই বিশাল দেশকে একান্ত ক'রে ভালোবাসতে হবে।

অশিক্ষিত চাষার দল সমীরের কথা ভালো ক'রে বুঝতে পারে না, কেবল মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয়, তারা যেন কিছু নতুন কথা শোনে, নতুন ক'রে পৃথিবীকে ভাবতে শেখে। তাদের কান্না থেমে যায়, তারা নতুন আলো দেখতে পায়।

সমীরের এক একবার মনে হয়, সে যেন এইসব হতভাগ্য আর মূঢ় স্ত্রীপুরুষদের অভিভাবক। এদের সুখ দুঃখ, ভালো মন্দ, অতীত আর ভবিষ্যৎ—সমস্তর জন্যই সে যেন দায়ী। এদের আর কোনোদিন সে ছাড়তে পারবে না। তার যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে।

মাঝে মাঝে তারা এক এক গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগায়, কিছু কিছু জিনিসপত্র কেনে, কোনো আশ্রয়ে এক আধদিন থাকে, কিম্বা নদীর কোনো নির্জন ছায়ায় সারাদিন সবাই মিলে বিশ্রাম করে—আবার নৌকা ছেড়ে দেয়। এমনি ক'রে দীর্ঘ একমাস কেটে গেল।

তাদের সঞ্চয় ফুরিয়ে এলো। খাবার জিনিসপত্র ফুরিয়ে গেল, টাকাকড়ি যা ছিল তাও আর রইলো না। এতগুলি স্ত্রী-পুরুষের গ্রাসাচ্ছাদন কি ভাবে চলবে—তাই ভেবে সমীর ব্যাকুল হয়ে উঠলো। উপরে বর্ষার আভাস দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টি নামতে

আর বিলম্ব নেই। এদিকে বড় নদীর পথে তারা উজান ঠেলতে ঠেলতে চলেছে, সকলেই পরিশ্রান্ত।

এমন দিনে এক বড় শহরের ঘাটে তারা নৌকা থামিয়ে নেমে পড়লো। একটা মস্তবড় আটার কল তারা দেখতে পেলো। একসঙ্গে এতগুলি লোককে নামতে দেখে লক্ষ্মণপুরের সাহেব লোক পাঠিয়ে ওদের মতলব জানতে চাইলেন। ওরা চোর ডাকাত কিম্বা আর কিছু, সেটা জেনে তবে তিনি পুলিশে খবর দিতে চান্। তাঁর পেয়াদা ঘাটে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করলো, এ ঘাটে তোমরা কি জন্য এসেছ? কে তোমরা?

সমীর এগিয়ে গিয়ে তার কথার জবাব দিল। বললে, হুজুর, আমরা আসছি কাটিহার থেকে। আমাদের দেশে বন্যার ফলে আমরা সর্ব্বস্বান্ত, তার ওপর মড়ক লেগেছে। আমরা কাজ খুঁজতে এসেছি, হুজুর। আমরা মজুরি করবো।

তাদের পরিচয় শুনে সাহেব অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তাঁর কলের অবস্থা তখন মন্দা। মজুরি বেশী দিতে হচ্ছে, অথচ আয় কম। অল্প মজুরিতে তখন তাঁর লোক দরকার ছিল। তিনি আবার প্রশ্ন করে পাঠালেন, তোমাদের মজুরি কত?

সমীর বললে, এখন আমাদের খোরাকির পয়সা হলেই চলবে।

সাহেব অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন, আচ্ছা, কাল থেকে ত্রিশ জন লোকের কাজ আমার চাই। তামাকের পয়সা উপরি দেবো।

সাহেব হিসেব ক'রে দেখলেন, জন পিছু তাঁ'র দুআনা কম খরচ পড়ে, আর সমীর দেখলো এই দুঃসময়ে যদি মেহন্নত করলে খেতে পাওয়া যায়—সুতরাং উভয় পক্ষেরই লাভ। ঘাটের পথেই একটা চালাঘরে সেদিন অনেকে আশ্রয় নিল। বাকি কয়েকজন —যাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক ছিল, তা'রা নৌকাতেই রইল। গ্রাম থেকে চিড়া, দই আর গুড় সংগ্রহ ক'রে এনে সমীর সবাইকে সেদিন খাইয়ে দিল। অনেক দুঃখ আর দুর্য্যোগের পর আজ সকলের মুখে হাসি দেখা দিয়েছে।

আটার কলের মালিক কোন্ এক মস্ত বড় ধনী হিন্দুস্থানী। এখান থেকে বহুদূরে কুমায়ূন জেলায় সে লোকটা এক বিরাট্ জঙ্গলের ইজারাদার ছিল। তারই প্রতিনিধিস্বরূপ এক বাঙ্গালী সাহেব এই কলের তদ্বির তদারক করেন। এই সাহেবের অধীনে কয়েকজন সহকারী লোক এই কারবারের বিলিব্যবস্থায় নিযুক্ত। এখানকার জায়গা জমী সমস্তই ইজারা নেওয়া। আশপাশে বহু জমি পতিত অবস্থায় রয়েছে। সাহেবটি যে বাঙ্গালী, সমীর প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সে সামান্য মজুর, দৈনিক ছয় আনা তার ভাতা, সেও একজন বেহারী বলে পরিচিত—সুতরাং সে আর আত্মপ্রকাশ করলো না। জমাদারের অধীনে পরের দিন থেকে তারা কাজে লেগে গেল।

কিন্তু নতুন মজুরের দলকে দেখে পুরনো মজুরের দল খুশী হোলো না। তিন চারদিনের মধ্যেই তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা

দিল। দিনকাল মন্দা, সেজন্য পুরনো লোকেরা আশা করেছিল, এবার বুঝি তাদের মজুরি কিছু বাড়বে। কিন্তু মাঝ থেকে নতুন মজুরের দল এসে অল্প বেতনে কাজ নিতে তাদের ভিতরে নৈরাশ্যের লক্ষণ দেখা গেল। তারা সাহেবের কাছে আবেদন জানালো। সাহেব জানিয়ে দিলেন, অবস্থা ভালো হ'লে বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

সমীর অবশ্য দুঃখিত হোলো। তাদের জন্য এতগুলি লোকের ক্ষতি হওয়াটা তা'র পক্ষে কাম্য নয়, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নতুন দেশে এসে তা'র পক্ষে অন্য কোনো ব্যবস্থা করা এখন সম্ভব নয়। সে নিরুপায় হয়ে চুপ ক'রে রইলো।

এর পরে সম্পূর্ণ একটি বছর কেটে গেছে।

*

* *

সমীর আশ্চর্য্য কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়েছে। সুদূর পশ্চিমের এই ছোট শহরে গত বছরে সে মজুর হয়ে ঢুকেছিল, আজকাল তার প্রভাব প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে অসামান্য। আটার কলের চারিদিকে চালাঘরগুলিতে তার অধীনস্থ মজুরেরা থাকে, সে তাদেব দলের দলপতি। আজকাল সে নিজে মজুরি করে না, কিন্তু মজুর দলের ভবিষ্যৎ কল্যাণের চিন্তায় তা'র দিন কাটে। আগে নদীতে পারাপারের কোনো খেয়া-ঘাট ছিল না, সুতরাং

ওপারের সঙ্গে এপারের যোগাযোগ ছিল অতি কম। সমীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে তা'র দলের পাঁচখানা নৌকা খেয়াপারের কাজে লাগিয়েছে, এবং এ কাজ তারই একচেটে। এই ব্যবস্থার ফলে ওপারের থেকে মজুরের দল আসে, পাইকারী ব্যবসায়ীরা এসে আটা কিনে নিয়ে যায়, এবং ফড়িয়ারা এসে এপারে শাক-সব্জী বিক্রি করে। খেয়া থাকার জন্য ওপারের গ্রামেরও বহু উন্নতি হয়েছে। এই কাজটির ফলে তা'র বেশ মোটা উপার্জ্জন হচ্ছে। কেবল এই নয়, আটার কলের প্রত্যেক মজুরের দৈনিক আয় থেকে সে দুটি ক'রে পয়সা নেয়। তা'র নিজের তাঁবে এখন মজুরের সংখ্যা দেড়শোর ওপর। সুতরাং সব রকমে যে উপার্জ্জন এবং সঞ্চয় হয়, তাই নিয়ে সমীর যৌথভাবে স্থানীয় ব্যাঙ্কে টাকা আমানত করছে। সে নিজে মজুর দলের অছি নিযুক্ত হয়েছে। এছাড়া এই কলের আশে পাশে বহু আবাদি জমি সে মজুরদের নামে জমা নিয়েছে। এক বছরের মধ্যে এরূপ উন্নতি হ'তে পারে, সে নিজেও কখনও কল্পনা করেনি। এত অল্প বয়সে তা'র এত প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখে কলের বড় সাহেব কেবল মুগ্ধই হননি, চিন্তিতও হয়েছিলেন। শ্রমিক দলের প্রতিনিধি এবং সম্পদশালী সমীরকে বড় সাহেব এখন বেশ একটু সমীহ করেন।

একদা আবাদি জমীতে লোকজন নিয়ে সমীর চাষ আরম্ভ ক'রে দিল। গম, ভুট্টা, ডাল, সর্ষে, এবং আশেপাশে মরশুমী

সজ্জী বসালো। তার অধীনে বহু লোক বহুদূর থেকে খাটতে এলো। যে সমস্ত চাষীরা দেনাগ্রস্ত, তারা অনেকেই সমীরকে তাদের জমী ছেড়ে দিল। সমীর তাদের দেনা শোধ ক'রে জমী নিজের খাস ক'রে নিল।

এই সব বিলি ব্যবস্থায় আরো দুবছর কেটে গেল।

সেবার বছরের মাঝখানে আর একটা সৌভাগ্যের তরঙ্গ এসে উপস্থিত। আটা কলের ব্যবস্থা ভালো থাকলেও ইদানীং অবস্থা মন্দা চলেছিল। হঠাৎ একদিন ঘোষণা হয়ে গেল, আটাকলের আর্থিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে। মালিক এই কলকে নিলামে চড়াচ্ছেন। সংবাদটি অশুভ, এর সঙ্গে বহু লোকের ভাগ্য জড়িত। কিন্তু খবরটা শুনে সমীর একটা ভয়ানক দুঃসাহস নিয়ে বীরের মতো দাঁড়ালো! সে নিলাম ডেকে টাকা জমা দিয়ে বসলো। সাত দিন পরে দেখা গেল, তার অধীনে বিরাট মজুরের দল হোলো এই কলের মালিক, এবং বাঙ্গালী বড় সাহেব এখন থেকে তার অধীনে চাক্‌রি করবেন। সমীর তার বিশ্বস্ত দুজন সহকারী—চন্দনলাল আর রামরূপ· এই দুজনের হাতে আটাকলের তত্ত্বাবধানের ভার ছেড়ে দিল। এমন আশ্চর্য্য ঘটনা এ তল্লাটে আর কোনোদিন ঘটেনি। সমীর এখানে একদিন রিক্ত হস্তে এসেছিল, কিন্তু আজ মাত্র চার বছরের মধ্যে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান ও জমিদারীর অভিভাবক হয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত হোলো। শহর আর গ্রামে দিকে

দিকে তা'র জয়ধ্বনি। সে রাজা নয়, সম্রাট নয়, কিন্তু দরিদ্র ও হতভাগ্য দেশের লোকের ভাগ্যবিধাতা!

কিন্তু যত বড় সৌভাগ্যই হোক, অতীত জীবনের দেনা শোধ না ক'রে সমীরের পরিত্রাণ নেই। যাদের সে দীর্ঘকাল বিশ্বাস করে এসেছে, তারা যে কোনোদিন বিশ্বাসঘাতকতা করবে, একথা সমীর কল্পনাও করেনি! চন্দনলাল আর রামরূপ হাতে ক্ষমতা পেয়ে ভাবলো, সমীরকে সরাতে না পারলে তারা সর্ব্বময় প্রভু হ'তে পারবে না। সমীর যদি স'রে যায়, তবে নির্ব্বোধ মজুরদের ভুলিয়ে তারা দুজনে একদিন এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কি ভাবে সমীরকে ধ্বংস করা যায়, সেইটিই আসল কথা। তাদের হাতে একটা চরম অস্ত্র ছিল।

হঠাৎ সমীরের কয়েকজন অনুচর গোপনে একদিন খবর দিল, জেলা পুলিশের বড় কর্ত্তা পুলিশ ফৌজ নিয়ে তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করতে আসছে। শিউগঞ্জের হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামী সমীর এবং প্রধান সাক্ষী লছমীকে যদি পাওয়া যায়, তবে বাকি আসামীদের খুঁজে বা'র করতে বিলম্ব হবে না। পুলিশকে সমীর চিরদিন ভয় করে। দীর্ঘ চার বছর ধ'রে যে তা'রা তদন্ত চালাচ্ছে, একথা বুঝতে তা'র দেরী হোলো না। কিন্তু একথা স্বপ্নেও সে মনে করেনি, চন্দনলাল আর রামরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আজকে সে যত বড়ই হোক, সে যে

একজন হত্যাকারী, একথা সে ভুলে গিয়েছিল। লছমীকে যদি ধরে তবে অনেক লোকের হবে প্রাণদণ্ড। সে যদি নিজে ধরা পড়ে তবে তারও সেই শাস্তি।

ঘণ্টাকয়েক পরে একজন অনুচর আবার এসে সংবাদ দিল, প্রায় পাঁচ মাইল দূরে পুলিশের দল এসে পড়েছে। সমীর ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠলো।

কিন্তু আর সময় নেই। সে চুপি চুপি গিয়ে রতন সর্দ্দারকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এলো। সব কথা জানিয়ে বললে, তোমার মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, সর্দ্দার। তোমাদের কোনো ভয় নেই, কেউ তোমাদের ধরতেও পারবেনা। যতদিনই হোক, আবার তোমার মেয়েকে নিয়ে একদিন ফিরে আসবো।

বুড়ো রতন সর্দ্দার কেঁদে বললে, হুজুর, তুমি যেখানে হোক লছমীকে নিয়ে যাও। কিন্তু তোমার বিপদ ঘটলে আমরা আর বাঁচবো না হুজুর।

সমীর তা'র পিঠ চাপড়িয়ে বললে, আবার আসবো।

লছমী এখন বেশ বড় হয়েছে। তা'র শরীরে অসীম শক্তি। কাউকে সে ভয় করেনা। সমীরের কথায় বিপদ বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ পালাবার জন্য রাজী হয়ে সে প্রস্তুত হোলো। সমীর যাবার সময় ব'লে গেল, একটু দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বিরাট পুলিশ ফৌজ সহরের সীমানায় এসে দেখতে দেখতে চারিদিকে অবরোধ ক'রে ফেললো। সহরে ঢোকবার সবগুলি পথ, এবং নদীর ধার— চারিদিকে পাহারা দাঁড় করালো, যাতে কেউ না বাহিরে যেতে পারে। তারপর পুলিশের বড় সাহেব সশস্ত্র লোক নিয়ে আটাকলের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

সমীর আর লছমী ততক্ষণের মধ্যে পালাতে পারলো কিনা ঠিক বুঝা গেল না।

নয়

ছোট গ্রাম্য শহর, সুতরাং পুলিশ এসে পৌঁছতে দিকে দিকে সোরগোল প'ড়ে গেল। অনেকে মনে করলে, বোধ হয় একটা কোনো স্বদেশী হুজুগ, তারা ভয়ে ভয়ে গা ঢাকা দিল। যারা অতশত বোঝেনা, তা'রা নিজেদের ঘর-দরজা বন্ধ ক'রে রাখলো। এ তল্লাটে এমন পুলিশের সমারোহ আর দেখা যায়নি। ছোট ছোট দোকানপাতি যাদের, কিম্বা গোলদার, তা'রা দোকান বন্ধ ক'রে স'রে পড়লো।

আগে থেকে খবর জানাজানি হ'লে পাছে খুনী আসামীরা পালিয়ে যায় এজন্য দারোগা সাহেব সমস্তটাই গোপন রেখে-ছিলেন। তাই হুড়মুড় ক'রে ফৌজ যখন এসে গ্রামকে ঘেরাও ক'রে ফেললো, তখন সেই ফাঁদ ডিঙিয়ে কারো পালাবার সাধ্য রইলো না। সকলেই অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যতই হোক, খবরটা কানাকানি হতে লাগলো। এখান থেকে ওখানে, দোকান থেকে বাজারে, হাট থেকে ঘাটে,—সব জায়গায় কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল।

বলা বাহুল্য এমন একটা খবর বিশ্বাস করাই কঠিন। এই মুলুকে সমীরকে সবাই জানে—পরোপকারী, বুদ্ধিমান, সাধু আর সচ্চরিত্র। এত বড় একটা ব্যবসা সে চালায়, এত লোক

তার আশ্রিত, এত টাকার সে মালিক, আর এত বড় সে মুরুব্বি, সে কিনা খুনে আসামী! কোন্ দেশে খুন ক'রে সে পালিয়ে এসেছে এখানে—এতগুলো লোককে এতদিন ধ'রে ধাপ্পা দিয়ে রেখেছে—এটা সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন বৈ কি! অনেকে বললে, এটা শত্রুর কারসাজি ; অনেকে বললে, পুলিশ একটা মিথ্যে মামলা সাজাতে চায়। যে লোকটা খুনে, সে কেমন ক'রে পরের কাজে এমন ক'রে নিজেকে বিলিয়ে দেয়।

একজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান পর্য্যন্ত ঠাট্টা ক'রে পুলিশের এক সেপাইকে ব'লে গেল, তোমাদের ত আর কাজকর্ম্ম নেই, তাই একজন ভালো লোককে খোঁচাতে এসেছো। আমাদের হুজুর দেবতা, সে কি কখনো খুনে হয়?

সেপাইটা তাকে ধমক দিল। বললে, যা—যা, ভাগ্। গরুর গাড়ী চালিয়ে খাস—তোকে অত বক্তৃতা দিতে হবেনা—পালা।

সত্যি কথা বললে তোমাদের বড় গায়ে লাগে, না সেপাইজি?

আবার!—ব'লে সেপাই গাড়োয়ানকে একটা তাড়া দিল।

বেচারা গাড়োয়ান তা'র গাড়ীতে বিরাট খড়ের বোঝা চাপিয়ে চলেছে। সেপাইয়ের ধমকে ভয় পেয়ে পাগড়ীটা গুছিয়ে গরুর ল্যাজ ম'লে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল। বুঝতে পারা যাচ্ছে, গ্রামের লোক অনেকেই চ'টে গেছে।

ওদিকে আর একজন সিপাইকেও কয়েকজন স্ত্রী পুরুষ মিলে ঘেরাও করেছে। সকলেরই কৌতূহল—ব্যাপারটা ঠিক কেমন জানবার জন্য। কুমোর, কাহার, ক্ষেতী, ঘাটমাঝি অনেকেই জড়ো হয়েছে। মেয়েরা সিপাইদের গালাগাল দিচ্ছে। একজন স্ত্রীলোক কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল, সে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, হুজুর খুন করেছে ত বেশ করেছে। জমিদারের লোক এসেছিল গ্রামে আগুন লাগাতে, মেয়ে চুরি করতে—হুজুরের লোক তাদের খুন করেছে, ভালো করেছে।

সেপাই ধমক দিয়ে বললে, এই—চুপ।

এঃ ভারি তম্বি! তোরা হুজুরের পায়ের যোগ্য নয়! ব'লে স্ত্রীলোকটি কাঠের বোঝা নিয়ে আবার বকবক করতে করতে চ'লে গেল, মাঠের পথ পেরিয়ে।

বেশ বুঝতে পারা গেল, গ্রামের মেয়েরাও পুলিশের আচরণে মহা অসন্তুষ্ট হয়েছে।

গ্রাম খুব ছোট নয়। জেলা বোর্ডের রাস্তা থেকে আরম্ভ ক'রে নদীর ঘাট পর্য্যন্ত তা'র সীমানা। অত বড় গ্রামে সমীর যে কোথায় লুকিয়েছে, তা'র সন্ধান পাওয়া কঠিন। সুতরাং পুলিশের লোকেরা আঁতিপাতি ক'রে তা'কে খুঁজে ফিরতে লাগলো। মামলার প্রধান আসামী হোলো সে, আর প্রধান সাক্ষী হোলো লছমী। রতন সর্দ্দারেরও নাম ছিল পুলিশের

খাতায়, কিন্তু সে নাম ভাঁড়িয়ে ইতিমধ্যে কোথায় সে স'রে পড়েছে, তা'কে খুঁজে বা'র করা যাচ্ছেনা।

এদিকে খানাতল্লাসী করতে করতে অপরাহ্ণ গড়িয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এলো। গ্রামের ঘরে ঘরে এরই মধ্যে টিমটিমে আলো জ্বলে উঠেছে।

সমীরকে খুঁজে না পেয়ে পুলিশের বড় সাহেব প্রমাদ গণলেন। অনেক খরচ ক'রে অনেক আয়োজনের পর আসামীকে তিনি গ্রেপ্তার করতে এসেছিলেন। জমিদার রঘুনন্দন প্রসাদ ওদিক থেকে পুলিশকে চাপ দিয়েছিল। বলেছিল, জেলার মধ্যে এত বড় একটা খুন-জখম হয়ে গেল, চার-পাঁচটা লোক মরলো, অথচ আসামীদের পাত্তা পাওয়া গেল না, এটা পুলিশের পক্ষে কলঙ্ক। রঘুনন্দন এটা কল্পনাই করেনি, এই খুন-জখমের প্রধান নায়ক হোলো সমীর—যে সমীর তারই আশ্রয়ে থেকে মানুষ হয়েছে। সে জানে, সমীর বেঁচে নেই, বেঁচে থাকলেও কেউ তাকে গুম করেছে, কিম্বা সমীর পালিয়ে গেছে তার নিজের দেশে। নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় জমীদার রঘুনন্দন সমারের জন্যে কাঁদছে। কিন্তু সে জানে না, সমীর হোলো তা'র আদর্শের সকলের বড় শত্রু।

যাই হোক, পুলিশ সাহেব অনেক রাত পর্য্যন্ত লক্ষণপুরের সর্ব্বত্র খানাতল্লাসী ক'রে স্থির করলেন, আসামী তাঁদের আসার আগেই গ্রাম ছেড়ে গোপনে পালিয়েছে। যারা পাকা বদ্‌মাস

তা'রা আগে থেকেই বিপদের গন্ধ পায়। সুতরাং পুলিশের আসবার কথা আর কেউ না জানুক, সমীর নিশ্চয় আগে আঁচ পেয়েছিল। এত সতর্ক হয়ে এসেও যে এমন বোকা ব'নে যেতে হবে, একথা বড় সাহেব কল্পনাও করেননি।

তিনি রাগে সিংহের মতো ফুলতে লাগলেন। ঠিক যেন শিকার হাত ছাড়া হয়ে গেছে, এমনি তা'র মুখ চোখের ভাব। তিনি হুকুম দিলেন, যত দূরেই হোক, যেখান থেকেই হোক, আসামীকে খুঁজে বা'র করা চাই। এই রাত্রেই তাকে ধরা চাই, বেশী দূর সে পালাতে পারেনি।

যেমন কথা অমনি কাজ। ছোট দারোগা তাঁর লোক লস্কর নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেপাইরা শিকারী কুকুরের মতন চারিদিকে ছুটলো। বড় বড় আলো জ্বললো, লাঠি ঠোকাঠুকি হোলো, কলরব উঠলো, রাত্রে হৈ চৈ প'ড়ে গেল।

কে একজন এসে খবর দিল, গ্রামের ছুদিকে মাঠ, সেই মাঠের দিকে আসামী নিশ্চয় লুকিয়ে আছে!

একজন বললে, রাস্তা ঘাট যদি পাহারা দেওয়া যায়, তবে সকাল হ'লেই আসামী ধরা প'ড়ে যাবে? পালাবার আর জায়গা থাকবে না।

বড় সাহেব হুকুম দিলেন, যেখানে যত পথ আছে, সব পথে লোক পাঠাও। আসামীর কাছে পিস্তল আছে মনে হচ্ছে, কারণ

তা'র লাইসেন্স ছিল, সুতরাং তোমরাও বন্দুক নিয়ে এক একদলে তা'র পিছু ধাওয়া করো।

একজন সেপাই বললে, আসামীকে চিনতে পারবো কেমন ক'রে ?

একজন বললে, ওঃ সে আমি পারবো, তুই চল্‌না ? তা'র গায়ে সাহেবী পোষাক—বড় লোক ছিল যে! আর এই ভারী চেহারা, মস্ত বাবু। হাতে কিন্তু পিস্তল, ভাই, মনে রেখো।

তৃতীয় সিপাই বললে, দেখবো আর গুলী চালাবো, আয় না তোরা!

সন্ধ্যার সময়ে ছোট দারোগার দল দূরের একটা গ্রামে এসে হানা দিল। এই গ্রামে অনেকদিন আগে একটা ডাকাতির মামলায় তারা তদন্ত করতে এসেছিল। সুতরাং এ অঞ্চল ছোট দারোগার পরিচিত। আজকাল নতুন ধানের মরশুম চলছে, সন্ধ্যার পরেও লোকে আলো জ্বেলে কাজ করছে। কয়েকখানা গরুর গাড়ী এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজকের মতন এই গ্রামেই পাহারা দিতে হবে, এইরূপ স্থির ক'রে পাহারা মোতায়েন রেখে তাঁবু ফেলা হোলো। গ্রামের লোকরা সকলেই কানাকানি করলো।

একখানা গরুর গাড়ী বিচালী বোঝাই নিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল। সতর্ক একজন সেপাই গলা বাড়িয়ে বললে, এই, কে যায় ?

গাড়োয়ান বললে, খড়ের গাড়ী, হুজুর।

কোথায় যাবে ?

মহেশগঞ্জের ঘাটে।

সেপাই একটা আলো হাতে নিয়ে এসে গাড়ীখানা বেশ ক'রে এদিক ওদিক পরীক্ষা করলো। গাড়োয়ান তা'কে সেলাম জানিয়ে বললে, হুজুর মা-বাপ।

আচ্ছা, যাও।—ব'লে সিপাই তা'কে ছেড়ে দিল। গাড়োয়ান তা'র হিন্দুস্থানী ভাষায় ভজন গাইতে গাইতে চ'লে গেল। সিপাইয়ের দল খুব সতর্ক সন্দেহ নেই।

আবার কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, একদল স্ত্রীলোক অন্ধকারে গান গাইতে গাইতে চলেছে। জঙ্গলে তা'রা কাঠ কেটেছে সারাদিন, গান গেয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে চলেছে। সেপাই তাঁবুর বাইরে এসে বললে, কোথা যাবি রে তোরা ?

একজন স্ত্রীলোক বললে, কে তুমি ?

আমি দারোগার লোক, খুনী আসামীর তল্লাসে এসেছি,—তোরা কোথা যাবি ?

আমরা যেখানেই যাই, আমাদের খুশি। ভারি বীরপুরুষ! আসামীদের ধরতে এসে মেয়েদের কাছে খোঁজ খবর নেওয়া। কে তোদের আসামী ?

লক্ষ্মণপুরের সমীর সর্দ্দার।

আসামীর খোঁজে ? তাহ'লে তাঁবুর মধ্যে কেন ? বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়া ?

সিপাইরা জড়োসড়ো হয়ে বললে, ভারি শীত।

তবে মরগে যা, খুঁজে পাবিনে—এই ব'লে মেয়েরা চ'লে গেল। যে-মেয়েটি এতক্ষণ কথা বললে, সেই কেবল তা'র কাঠের বোঝা নিয়ে আবার গান গেয়ে চলতে লাগলো নিজের পথে। সতর্ক সেপাইয়ের দল সজাগ হয়ে ব'সে রইলো তাঁবুর দরজায়। তাদের আশা আছে, আসামীকে কোনো প্রকারে ধরতে পারলে তারা সবাই মোটা বকশিস পাবে। যদি ধরতে নাও পারে তাহলেও এই খানাতল্লাসীর ব্যাপার শেষ হ'লে তাদের উপরিটা মারা যাবে না। তা'রা আনন্দেই আছে, সন্দেহ নেই। নিজের তল্পি-তল্পা খুলে তা'রা রাত্রের আহারাদির জন্য ছাতু মাখতে ব'সে গেল। গ্রাম থেকে একজন দুধ নিয়ে এলো।

ঘণ্টা দুই সবেমাত্র পার হয়েছে, এমন সময় একজন সিপাই বহুদূর থেকে হল্লা করতে করতে সাড়া দিয়ে ছুটে এলো। ছোট দারোগা তার দলবল নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপার কি ?

লোকটা বললে, ব্যাপার গুরুতর।

আরে হয়েছে কি, খুলেই বল না ?

সে বললে, আমি আসছি লক্ষ্মণপুর থেকে।

বেশ, তারপর ? সব ভালো ত ?

লোকটি হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললে, না, খবর খারাপ।

কি রকম ?

আসামী আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়েছে। সেই মেয়েটাকেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ছোট দারোগা বললে, তা ত জানি, তুমি হাঁপাতে হাঁপাতে পোড়ার মুখ নিয়ে এলে কি জন্যে ?

হুজুর—

কি শুনি ?

হুজুর—আমাদের সামনে দিয়ে সে-লোকটা—

ছোট দারোগা বললে, পালিয়েছে, এই ত ?

সেপাই বললে, না, হুজুর—

তবে ?

লোকটা আমাদের বোকা বানিয়েছে।

ছোট দারোগা বললে, বোকাকে আবার কে বোকা বানাবে ?

সেপাই বললে, হুজুর, আপনাকেও বোকা বানিয়েছে সে !

ছোট দারোগা গরম হয়ে বললে, এই—খবরদার।

সিপাই বললে, হুজুর মা-বাপ। হুজুরের মতন এত বড় একজন দারোগা—যার দাপটে বাঘে-গরুতে একসঙ্গে জল খায়, যার ভয়ে জেলা কাঁপে, যাকে লাটসাহেব সব কাজে ডেকে পাঠায়, তাকে কিনা—

ছোট দারোগা নিজের সুখ্যাতি শুনে ভারী খুশী হলেন। হাসিমুখে সস্নেহে বললেন, এবার ব্যাপার কি বল্‌ত ?

সিপাই বললে, আপনাকেও সে ঠকিয়ে গেল! দেখে নেবো তা'র ঘাড়ে ক'টা মাথা!

কেমন ক'রে ঠকালো রে ?

সিপাই তখন থেমে বললে, হুজুরের পাশে দল নিয়ে আমরা যখন দাঁড়িয়েছিলুম—সেই সময় গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান সেজে গাড়ী নিয়ে আসামী হাসতে হাসতে চ'লে গেল—

বলিস কিরে ?

হাঁ হুজুর—এই যে, এই রাস্তায় গেছে—এখনো চাকার দাগ রয়েছে। সেই মেয়েটাও নাকি গা ঢাকা দিয়েছে হুজুর।

একটা ভয়ানক সোরগোল উঠলো। ঘণ্টা দুই আগে একখানা গাড়ী এই পথ দিয়ে গেছে বৈ কি। গাড়োয়ানটা ভজন গান গাইছিল, সকলেরই মনে আছে।

সবাই প্রস্তুত হয়ে ধর ধর শব্দে গ্রামে কোলাহল জাগিয়ে সেই পথে ছুটলো। আর আসামীর নিস্তার নেই, এবার তাকে ধরা দিতেই হবে।

পুলিশের দল পথ পেরিয়ে মাঠ ডিঙিয়ে জঙ্গল ছাড়িয়ে ছুটলো। মাঝখানে একখানা গ্রাম পড়লো। সেখানে জিজ্ঞেস ক'রে জানা গেল, সত্যিই এই রাস্তা দিয়ে ঘণ্টা দেড়েক আগে একখানা গরুর গাড়ী পেরিয়ে গেছে, গাড়োয়ান ভজন গান গাইছিল।

সঙ্গে মেয়েছেলে ছিল জানিস ?

একটা লোক কি যেন ভেবে বললে, সঙ্গে ছিলনা বটে, তবে—হ্যাঁ, একটি মেয়েছেলে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘণ্টা-আগে এই পথ দিয়ে গেছে—এ গাঁয়ের মেয়ে সে নয়। ভারী মুখরা মেয়ে বটে।

কোন্ দিকে গেছে বল্‌ত ?

তারা বললে, হুজুর, আন্দাজ করতে পারি, তারা গেছে মহেশগঞ্জের দিকে—

ছোট দারোগার দল অন্ধকার পথ পেরিয়ে মহেশগঞ্জের দিকে ছুটলো। পুলিশের কাজের কি ঝকমারি—রাতই হোক, আর দিনই হোক, কাজ পড়লে যেতেই হবে। সতর্কচক্ষু রেখে তা'রা দৌড়তে লাগলো।

মহেশগঞ্জে এসে যখন পুলিশের দল পৌঁছলো, তখন বেশ রাত হয়েছে। ছোট্ট গ্রাম, সপ্তাহে একদিন হাট বসে। কিন্তু শীতের রাত্রে এরই মধ্যে সব নিশুতি। কোথায় খুঁজবে, কা'কে ডাকবে, তা'র কোনো ঠিক নেই। কেবল একজন লোক বললে, হাঁ, খানিকটা আগে একখানা গরুর গাড়ী এ গাঁয়ে ঢুকেছে, আমরা দেখছি। খড়ের গাড়ী।

কোথায় ? কোথায় বল্‌ত ? কোথায় গাড়ীখানা ?

ঘাটের দিকে যান্, দেখতে পাবেন।

সঙ্গে কোনো মেয়েছেলে দেখেছ ?

মেয়েছেলে ! হ্যাঁ, হ্যাঁ—তবে সঙ্গে দেখিনি, কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে একজন মেয়েছেলে এ গাঁয়ে ঢুকেছে বটে। এ গাঁয়ের মেয়ে সে নয়। দেখুন ত, সেও ঘাটের দিকে গেছে।

দারোগার দল বাঘের মতো ঘাটের দিকে ছুটলো। ঘাট বেশীদূরে নয়। নদীর ধারে সবাই এসে পৌঁছলো, এবং একখানা গরুর গাড়ী দেখে আনন্দে তা'রা চেঁচামেচি ক'রে উঠলো। পুলিশের লোকের হাতে টর্চ ছিল, তা'রা তীব্র আলো ফেলে এখানে ওখানে আসামীকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। কিন্তু ঘাটের চারিদিক নির্জন, কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই।

ঘাটে একখানা ডিঙি নৌকা বাঁধা ছিল মাত্র, তা'র ভিতরে টিমটিম ক'রে কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। ছোট দারোগা নেমে এসে ডাকলেন, এই মাঝি—

ভিতর থেকে সাড়া এলো, কে, হুজুর ?

আমরা পুলিশের লোক, বেরিয়ে আয়—

মাঝি ভিতরে ব'সে রুটি বানাচ্ছিল। ছোটদারোগার ডাক শুনে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো। তা'র মুখের ওপর টর্চ ফেলে সবাই তা'কে উত্তমরূপে পরীক্ষা করলো। লোকটা ত' একেবারে অবাক। জীবনে সে দারোগাও দেখেনি, টর্চও দেখেনি। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে বললে, হুজুর, কি হুকুম ?

দারোগা বললে, এই রাস্তায় একটা লোককে ওই

গাড়ীখানায় আসতে দেখেছিস ? ওই যে গরুর গাড়ীটা।—বল্ সত্যি ক'রে, সত্যি না বললে কিন্তু থানায় নিয়ে যাবো।

মাঝি ব্যাটাকে যত সরল মনে হয়েছিল তত সরল সে নয়। প্রশ্ন শুনে একটু খতিয়ে সে বললে, হাঁ, হুজুর, আমি জানি।

জানিস্ ? শিগগির বল্—

ভয়ে ভয়ে মাঝি বললে, আমাকে বলতে মানা করেছিল, হুজুর। লোকটাকে আমিও সন্দেহ করেছিলুম দেখে—

কোথায় সে ?

মাঝি বললে, লোকটা ভজন গান গাইতে গাইতে গাড়ী নিয়ে এলো। একটা মেয়েছেলে তা'র সঙ্গে এসে জুটলো।

ছোট দারোগা উল্লসিত হয়ে বললেন, তারপর ? সব সত্যি বল্‌বি। এখুনি বকশিস দেবো।

মাঝি হাত যোড় ক'রে বললে, ধরা যখন পড়েছি হুজুর, সব সত্যি বল্‌ব। ওরা দুজন অন্ধকারে এসে আমার পায়ে প'ড়ে কাঁদলো। বললে, মাঝি রক্ষা করো—

হুঁ, তারপর ?

তাদের কাছে পয়সা কড়ি ছিলনা। বললে, মাঝি, দয়া ক'রে তোমাদের ডিঙিতে আমাদের পার ক'রে দাও, নৈলে এখুনি আমরা পুলিশে ধরা প'ড়ে যাবো। হুজুর মা-বাপ—সত্যি বল্‌ব, আমার দয়া হোলো।

পার ক'রে দিলি ?

হ্যাঁ হুজুর, এই আধঘণ্টা আগে ওপার থেকে ডিঙি নিয়ে ফিরেছি।

কতদূর গেছে বলতে পারো ?

হ্যাঁ, পারি। বেশীদূরে দুজনে যায়নি। ওই ওপারে রামনগরের গায়ে সাহেববাগান আছে, জানেন ত—?

একজন সেপাই বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, আমার দেশ ওখানে—

মাঝি বললে, ওই সাহেববাগানে তা'রা গিয়ে ঢুকলো, আমি দেখলুম। রাতটা তা'রা ওখানেই থাকবে হুজুর, আমাকে বলেছে।

ছোট দারোগা বললে, রাতটা ওখানে থাকবে, ঠিক জানিস তুই ?

ঠিক জানি, হুজুর।

তবে চল্, আমাদের শীগগির পার ক'রে দে।

ছোট দারোগা দলবল নিয়ে তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠলো। দুজন সিপাই এপারে গরুর গাড়ীখানা আটক ক'রে পাহারায় রইলো। ওদিকে ডিঙি ছেড়ে দিল। মাঝি তাড়াতাড়ি বাইতে লাগলো। এক সময় দারোগা তা'র সহকর্ম্মীকে বললে, আমরা চুপিচুপি বাগানটা ঘেরাও ক'রে ওৎ পেতে থাকবো, কাল ভোরে গ্রেপ্তার করবো, বুঝলে ?

সহকর্ম্মী বললে, সেই ভালো হুজুর, নৈলে অন্ধকারে খোঁচা দিতে গেলে পালাবে, ধরতে পারবো না। ওরা ভারি শয়তান।

ছোট দারোগা ব'সে ব'সে মাঝির কাছ থেকে আরো সব

গোপনীয় খবর সংগ্রহ ক'রে নিল। তারপর দেখতে দেখতে পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ডিঙি এসে পারঘাটায় লাগলো। চুপি চুপি অন্ধকারে সবাই ঘাটে নামলো। ছোট দারোগা খুশী হয়ে মাঝিকে একেবারে থোক্ দুটো থাকা বকশিশ দিয়ে ফেললে।

হুজুর মা-বাপ—ব'লে মাঝি পরম পুলকিতভাবে এসে আবার তা'র ডিঙি ছেড়ে দিল।

আবার এপারে ডিঙি ফিরিয়ে এনে মাঝি রুটি বানাতে বসলো। রুটির পর তরকারী চড়ালো, তরকারীর পর দুধ জ্বাল দিল। তারপর অনেক গোছগাছ ক'রে সে বাইরে এলো। ঘাটের ওপর উঠে এসে দেখলো, সারাদিন পরিশ্রমের পর সিপাই দুজন গরুর গাড়ীখানার পাশে শুয়ে অকাতরে অজ্ঞান হয়ে ঘুমুচ্ছে। আপাদমস্তক তাদের কম্বলের মুড়ি। পাশেই তাদের কাপড় চোপড় পড়ে রয়েছে। মাঝি একবার ঠাহর ক'রে সব দেখলো, তারপর আস্তে আস্তে সে ঘাটের দিকে নেমে গেল।

ঘাটের ধারেই একটা অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছের নীচে এসে সে আস্তে তিনবার হাতের তালি দিল। তখনই গাছ থেকে নেমে এসে লছমী দাঁড়ালো। হাসিমুখে বললে, ওরা আর আসেবনা ত ?

সমীর বললে, আজকের রাতটার মতন আর ভয় নেই। এসো, আমরা ধীরে সুস্থে খাওয়া দাওয়া করি। সেপাইরা ঘুমোক, আমরা মজা ক'রে খাই।

দশ
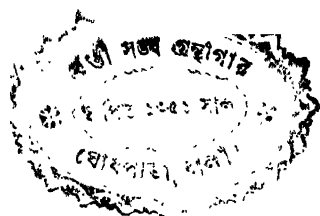
আহারাদি সেরে নৌকা নিয়ে পালাবার আগে লছমী পা টিপে টিপে ঘাটের উপর উঠে এলো। সেদিন জ্যোৎস্নারাত, অস্পষ্টভাবে এদিক ওদিক দেখা যাচ্ছিল। লোকজন কাছাকাছি কেউ নেই, কেবল গ্রামের কোন্ প্রান্ত থেকে হিন্দুস্থানী যাত্রা-গানের আওয়াজ মাঝে মাঝে কানে আসছে।

লছমী আর সমীর সিপাইদের উৎপাতে যথেষ্ট হায়রাণ হয়েছিল, সুতরাং পুলিশের লোকদের প্রতি তাদের দয়ামায়া একটুও ছিল না। লছমী পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে গরুর গাড়ীর খড়গুলির মধ্যে গোটা চার পাঁচ দেশালাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিল। সেটা শীতকালের শেষ, সুতরাং শুকনো খড়গুলিতে অতি সহজেই আগুন ধ'রে গেল।

তারপর চারটি খড় হাতে নিয়ে সে নিঃশব্দে নিদ্রিত সিপাই দুজনের কাছে এগিয়ে এসে তাদের পায়ের দিকে সেগুলি রেখে আবার আগুন ধরিয়ে দিয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়াল। দেখলো, আগুন বেশ ধ'রে উঠেছে। তখন সে আর পিছন ফিরে তাকালো না, দ্রুতপদে ঘাটের দিকে চ'লে গেল।

বেশীক্ষণ নয়, মাত্র মিনিট দুই—তারই মধ্যে দেখতে দেখতে গরুর গাড়ীতেও যেমন আগুন ধরলো, লোক দুইটার কাপড় চোপড়ও তেমনি ধ'রে উঠলো।

হঠাৎ আগুনের ছ্যাঁকায় ঘুম ভেঙ্গে লোক দুটো পাগলের মতো লাফ দিয়ে উঠে চীৎকার করলো, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গরু দুটো দড়ি ছিঁড়ে তাদের দুজনের গায়ে ধাক্কা মেরে প্রাণভয়ে একদিকে ছুটলো।

চাষীদের পল্লী ছিল খুব কাছাকাছি। গোলমালের মধ্যে আগুনের লকলকে শিখা যখন উপর দিকে উঠেছে, সেই সময় চাষীরা হৈ চৈ ক'রে ছুটে এলো। দাউ দাউ ক'রে তখন আগুন জ্ব'লে উঠেছে।

লছমী এতটা কল্পনা করেনি। সামনে অগ্নিকাণ্ড দেখে সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে নৌকায় উঠে বললে, সর্দ্দার, শিগগির নৌকা ছেড়ে দাও, ওরা এসে পড়বে।

আমোদ আর কৌতুকের মধ্যে সমীর যখন নৌকার দড়ি খুলে দেবে, সেই সময় একটা নতুন বিপত্তি দেখা গেল। হঠাৎ দুটো লোক কোথা থেকে যমদূতের মতো এসে নৌকা ধ'রে বললে, এই—খবরদার। এ আমাদের নৌকা, কোথা নিয়ে যাও? রোখো – রোখো—এই বদমাস—চোট্টা—ডাকু—

নৌকার মালিকের চেঁচামেচিতে এদিকে কয়েকজন ছুটে এসে নৌকা ঘিরে দাঁড়াল। লছমীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ, সমীরও

নিরুপায় হয়ে তাদের দিকে একবার তাকালো। লছমীর একটা সামান্য ভুলের জন্য অবশেষে চরম মুহূর্ত্তে তারা ধরা প'ড়ে গেল! বাস্তবিক, পালাবার আর কোনো পথ নেই।

ওদিকে আগুন লাগার হৈ চৈ, সিপাইদের চীৎকার, লোকজনের ছুটোছুটি, গরু ছুটোর দাপাদাপি—আর এদিকে চোর ধরা পড়ার চেঁচামেচি এবং মার মার শব্দ—সব মিলে রাত্রির ঘুমন্ত গ্রাম কল কোলাহলে ভ'রে উঠলো।

নৌকার উপরে উঠে যখন তাদের দুজনকে সবাই ধ'রে ফেলতে এলো, লছমী তখন ভয়ার্ত্ত মুখে ব'লে উঠলো, সর্দ্দার, কি হবে?

বাঁচবার আর কোনো উপায় সমীরের মাথায় এলো না। তখন সে সহসা তা'র ঝুলির ভিতর থেকে পিস্তল বা'র ক'রে দুড়ুম ক'রে একটা আওয়াজ করলো। ভীড়ের মধ্যে একটা লোকের হাতে গুলী লাগতেই সকলে নৌকা থেকে ভয়ে লাফ দিয়ে জলে পড়তে লাগলো। তখনই পিস্তল হাতে নিয়ে সমীর বাইরে পাটাতনের উপর এসে দাঁড়ালো, এবং সঙ্গে সঙ্গে লছমী দড়িটা টেনে নিয়ে লগিটা নামিয়ে নৌকা জলের মধ্যে বা'র ক'রে নিয়ে এলো। চারিদিকে 'ডাকাত, ডাকাত' রব উঠলো।

কিন্তু তখন আর কোনোদিকে তাকাবার সময় নেই। পিস্তলটা রেখে সমীর দুই হাতে দাঁড় বেয়ে নৌকা নিয়ে ছুটলো ভাঁটির টানে। ছোট নৌকা তীরবেগে দক্ষিণদিকে ভেসে চললো।

লছমী হাল ধ'রে সেই উত্তেজনার মধ্যে একবার তাকিয়ে দেখলো, জ্যোৎস্নার আলোয় অদূরে গ্রামের ঘাটের ধারে তখন লকলক করছে আগুনের শিখা, আর তারই ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে লোকজনের গগনভেদী কলরোল !

লছমী হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকলো, সর্দ্দার—

সমীর বললে, হাঁ, আর আমাদের ধরবার সাধ্য কা'রো নেই। খুব বেঁচে গেছি যা হোক।

তাদের নৌকা চললো ছুটে দক্ষিণে।

তারা যখন জ্যোৎস্নার আলোয় বহুদূর নদীপথে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেই সময় এপার থেকে একজন সেপাই নৌকা নিয়ে গেল ওপারে। গোলমালের মধ্যে একটা কথা তা'রা জানতে পেরেছিল, ডাকাত আর কেউ নয়, স্বয়ং সমীর সর্দ্দার। আর মেয়েটাও যে সেই লছমী, এ সম্বন্ধেও তাদের সংশয় রইলো না। সুতরাং সেপাই দুজন হল্লা করতে করতে ওপারে গিয়ে চেঁচামেচি ক'রে ছোট দারোগার দলকে খবরটা দিল। বুঝতে আর বাকী রইলো না, সেই সর্দ্দার ছোকরা নৌকার মাঝির ছদ্মবেশে তাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে পালিয়েছে। ছোট দারোগা আবার তাকে দুটো টাকা বকশিস দিয়ে ফেলেছেন, এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে ?

গ্রামের আগুন যখন নিবলো তখন সকাল হয়েছে।

অনেকের ঘর পুড়েছে, মরাই জ্বলেছে, এবং আগুন নেবাতে গিয়ে অনেকেরই হাত পায়ে ছ্যাঁকা লেগেছে। ছোট দারোগা ঘুরে ঘুরে সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করলেন।

জেলা সদরে খবরটা গিয়ে পৌঁছলো। আসামীকে ধরবার জন্য সর্ব্বত্রই খবর ছুটলো। কয়েকঘণ্টার মধ্যে কতদূর পর্য্যন্ত আসামীরা পালাতে পারে তারই একটা আন্দাজ জানিয়ে ছোট দারোগা দ্রুতগতিতে তাঁর রিপোর্ট দাখিল করলেন। সামান্য একটি লোককে ধরবার জন্য পুলিশ ফৌজ যে বিরাট আয়োজন করেছিল, তা যে এমন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে, একথা কেউ কল্পনাও করেনি।

এদিকে শেষরাত্রি অবধি নৌকা চালিয়ে ভোরের দিকে দুজনেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লো। উপস্থিত বিপদের হাত থেকে তা'রা পরিত্রাণ পেয়েছে বটে, কিন্তু কোথায় গিয়ে তারা উঠবে, কেমন ক'রে আবার তা'রা নতুন ব্যবস্থা করবে, এই নিয়ে সমীর খুব চিন্তায় পড়লো। কিন্তু প্রভাত হবার আগেই এক অচেনা ঘাটে এসে পৌঁছে একটু দূরে নৌকা বেঁধে সমীর আর লছমী বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিল।

ঘুম ভাঙলে দেখা গেল, বেশ সকাল হয়েছে, রোদ উঠেছে। ঘাটের পথে অনেক লোকজনের ভীড়। কি যেন একটা পর্ব্ব উপলক্ষ্যে নদীতে সকলেই স্নানে এসেছে। অদূরে এক শিবমন্দিরে পূজার শাঁখঘণ্টা বাজছে। খোঁজ

খবর নিয়ে জানা গেল, আজকে হাটের দিন। কাছেই রেল ষ্টেশন।

পুলিশের লোক এতক্ষণ নদীর পথ ধ'রে তাদের পিছু পিছু আসছে তা'তে আর সন্দেহ নেই। সুতরাং নৌকাটা এবার ছেড়ে দেওয়াই উচিৎ। তাদের সঙ্গে কাপড় চোপড় সামান্যই, লছমী সেগুলি সঙ্গে নিল। সমীর তা'র কাঁধের ঝুলির মধ্যে নিল টাকার পুঁটলী আর পিস্তল। তারপর দুজনে নদীতে স্নান ক'রে হাট থেকে পেট ভ'রে খেয়ে ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল।

খবর নিয়ে জানা গেল, একটু পরেই পশ্চিমের গাড়ী আসবে। লছমী জিজ্ঞেস করলে, আমরা কোন্‌দিকে যাবো, সর্দ্দার ?

সমীর বললে, তা ত' বলতে পারিনে ?

লছমী বললে, পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াবো কতদিন ?

তা হ'লে কি ধরা দেবে নাকি ?

না, তা দেবো না।

সমীর বললে, আমি একটা কথা ভাবছি। পশ্চিমের দিকে কোথাও গিয়ে বেনামীতে আবার একটা জমী কিনবো, সেখানে চাষবাস করবো—তারপর তোমার বাবাকে আর আমার দুই একজন লোককে সেখানে আনবো।

লছমী বললে, যদি সেখানেও পুলিশে ধরা পড়ি ?

তাহলে আবার সেখান থেকেও পালাবো !

লছমী হাসিমুখে বললে, পালিয়ে বেড়াতে আমারও বেশ লাগে, সর্দ্দার। যেখানে সেখানে যাবো, বনের ফল খাবো, নদীর জল খাবো।

তারা সবেমাত্র সুস্থ হয়ে এক জায়গায় এসে ব'সে গল্প করছে এমন সময় হাটের তলায় একটা গোলমাল শোনা গেল। নদীর ঘাটে একখানা নৌকা পাওয়া গিয়েছে, সেখানা ডাকাতের নৌকা, পুলিশে আটক করেছে। হাটতলায় একটা হৈ চৈ আরম্ভ হয়ে গেছে। আসামীদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

পুঁটলীটা লছমীর কাছে জিম্মা দিয়ে সমীর উদ্বিগ্নভাবে উঠে দাঁড়ালো। আড়ালে আবডালে খোঁজ নিয়ে সে তখনই বুঝতে পারলে, এখানকার পুলিশের কাছে তাদের খবরটা এসে পৌঁছে গেছে। তাদের খোঁজাখুঁজি চলছে। পুলিশের সতর্ক চক্ষু এড়িয়ে এই অজানা দেশে কোথাও পালাতে গেলে এখুনি দুজনে ধরা প'ড়ে যাবে। অথচ এর পরে কি যে তা'রা করবে সমীর মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাবতেও পারলে না।

দেখতে দেখতে ঘাটের পথে, হাটে বাজারে, ষ্টেশনে—সর্ব্বত্র পুলিশের লোকে ছেয়ে গেল। সর্ব্বত্রই এই কানাকানি শোনা গেল, একজন খুনী ডাকাত এই গ্রামের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়িয়েছে, তা'কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই ডাকাতের সঙ্গে আছে একজন মেয়েছেলে—বয়স তাদের অল্প।

সমীর গিয়ে দানাপুরের দুখানা টিকিট কেটে নিয়ে এলো। তারপর লছমীর সঙ্গে কি যেন একটা গোপনে পরামর্শ করলো।

ঘাটের পথে খানিকটা হাঙ্গামা বাধিয়ে পুলিশের লোকেরা ষ্টেশনে এসে হাজির হোলো। সমীর দূর থেকে তাদের লক্ষ্য ক'রে লছমীকে সতর্ক ক'রে দিল। পুলিশের লোক ষ্টেশনের মধ্যেই কতকগুলো লোককে ধ'রে জেরা করতে লাগলো, কয়েক-জনকে মারধরও করলো। তাদের সঙ্গে একজন সার্জ্জেণ্ট, ষ্টেশন মাষ্টার, জনদুই জমাদার, এবং আরও কয়েকজনকে দেখে সকলেই ভীত হয়ে এদিক ওদিক পালাচ্ছিল। তারা ক্রমশঃ অগ্রসর হতে লাগলো।

ওদিকে গাড়ী আসতে আর বিলম্ব নেই। সিগন্যাল প'ড়ে গেছে। কোনক্রমে গাড়ীতে উঠে চড়তে পারলে সমীর আর লছমী এযাত্রা রক্ষা পেতে পারতো।

কিন্তু গাড়ী আসবার কিছু আগে পুলিশের দল এসে তাদের ঘিরলো। সমীর তখন লম্বা হয়ে প্রায় অচেতন অবস্থায় চিৎ হয়ে রয়েছে, আর লছমী তার মাথার কাছে ব'সে হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে। চীৎকার ক'রে মাথা চাপড়ে বলছে, ওরে বাবুয়া রে, হামার নসিব ফাটল্ বা রে—

পুলিশের দারোগা কাছে এসে দাঁত খিঁচিয়ে বললে, এই, চেঁচাচ্ছিস কেন ?

কিন্তু লছমী থামলো না, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাউমাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো—হামি কেন নাইতে এলুম, হামি কোন্ মুখ নিয়ে ফিরে যাবো—হা ভগবান—

পুলিশের লোকরা তখন বুঝতে পারলো, এই মেয়েটি মরদের সঙ্গে এসেছিল স্নানে, বাড়ী তাদের বখ্‌তিয়ারপুরের কোন্ গ্রামে—কিন্তু ফিরে যাবার আগে তা'র মরদের কলেরা রোগ হয়। দারোগা পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, রোগী প্রায় দাঁত খিঁচিয়ে প'ড়ে আছে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ—। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের মধ্যে এরকম প্রায়ই হয়, সুতরাং তাঁরা সকলে বিরক্ত হয়ে ডাকাতের সন্ধানে অন্যত্র চ'লে গেলেন। লছমী ব'সে ব'সে কাঁদতে লাগলো।

ট্রেণ এসে হাজির হোলো। প্রত্যেক গাড়ীর দরজার কাছে ছদ্মবেশী পুলিশের লোক সতর্ক ভাবে রইলো, পাছে কোনো ফাঁকে আসামী তাদের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যায়। পালাবার সুযোগ সুবিধা কোথাও নেই। গাড়ী বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না, সুতরাং লছমী উঠে দাঁড়িয়ে হাউমাউ ক'রে চেঁচাতে লাগলো। এ গাড়ীতে উঠতে না পারলে তা'কে এই বিদেশে বিভূঁয়ে প'ড়ে থাকতে হবে।

কিন্তু তা'কে সাহায্য করবার কোনো লোক সেখানে পাওয়া গেলনা। অবশেষে তা'র চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে জন দুই পুলিশের সেপাই এসে সমীরকে ধরাধরি ক'রে একসময়ে গাড়ীতে তুলে দিল। লছমী পিছনে পিছনে উঠে এসে সমীরকে সযত্নে

এক জায়গায় শোয়ালো। এইটুকু নাড়াচাড়ায় রোগীর ভয়ানক পরিশ্রম হ'য়ে সত্য সত্যই হাঁপাতে লাগলো। তা'র অবস্থা নিতান্তই খারাপ।

গাড়ীর বাঁশী বাজতেই লছমী ব'লে উঠলো—ওই যা, পুঁটলীটা? ও ভাই সেপাই, দাও ভাই লক্ষ্মীটি, ওই যে ওই পুঁটলীটা, ভুলে ফেলে এসেছি ওখানে—

একজন সেপাই তাদের সেই কাপড় চোপড় বাঁধা পিস্তল আর টাকার পুঁটুলীটা এনে লছমীর হাতে তুলে দিল। তার মনে একটুও সন্দেহ হোলো না। সেই সময় গাড়ীও ছাড়লো।

কিন্তু গাড়ী ছাড়বার পর দেখা গেল, তাদের কামরায় জন-চারেক পুলিশের অফিসার উঠেছে। তাদের আলোচনা থেকে জানা গেল, এই কাছাকাছি কয়েকটা ষ্টেশনের মধ্যেই আসামী আনাগোনা করছে। অন্যান্য সব পথে পাহারা আছে, এবং প্রত্যেক ষ্টেশনে-ষ্টেশনে রেলওয়ে পুলিশকে সতর্ক থাকতেও বলা হয়েছে। ওদের হাতের কাছেই যে আসামীরা বমালসুদ্ধ ব'সে রয়েছে, একথা তা'রা স্বপ্নেও ভাবতে পারলো না।

একজন জিজ্ঞেস করলো. তোমরা কোথায় যাবে?

চোখের জল মুছে লছমী বললে, দানাপুর।

দানাপুর! এ গাড়ী ত দানাপুরে যাবে না!

তা হলে কি হবে? পরের ইষ্টিশানে তাহ'লে আমাদের নামিয়ে দিয়ো, বাবুজি।—ব'লে লছমী অচেতনপ্রায় সমীরের

মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। রুগ্ন সমীর মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ করছিল। পেটে তা'র নাকি ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। পুলিশ অফিসাররা সহানুভূতির দৃষ্টিতে তা'র দিকে তাকালো। লছমী মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে ঈষৎ হাসলো। সমীর যে এমন চমৎকার রোগীর অভিনয় করবে, সে ভাবতেও পারে নি। আর সমীর ভাবছিল, লছমী যে এমন সুন্দরভাবে হাউমাউ ক'রে কাঁদতে পারবে, এমন নিখুঁৎ ছদ্মবেশ ধরবে, এ একেবারে আশাতীত। কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে কথা বললে না, এমন কি হেসে ফেলবার ভয়ে পরস্পরের মুখের দিকেও তাকালো না। কেবল উদ্বেগে দুজনে আড়ষ্ট হয়ে রইলো। এমনি ক'রে ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেল।

কি যেন একটা জংশন ষ্টেশনে এসে ট্রেণ থামলো। তখন মধ্যাহ্ন, বসন্তকালের রোদ চারিদিকে টা টা করছিল। গাড়ী থামতেই দেখা গেল, এ ষ্টেশনেও বিরাট পুলিশের দল ডাকাত ধরবার জন্য চারিদিক অবরোধ ক'রে রয়েছে। লছমী আর সমীর ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

কিন্তু কলেরা রোগীকে নিয়ে লছমীকে নামতে হবে। পুলিশ অফিসাররা ধরাধরি ক'রে সমীরকে নামালো। লছমী তা'র অবস্থা দেখে আবার হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। অনেকে এসে তাদের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালো। বিন্দুমাত্রও কেউ সন্দেহ করলো না।

একজন অফিসার বললে, এই বিটিয়া, এখানে হাঁসপাতাল

আছে। রোগীকে নিয়ে বয়েল্ গাড়ী ক'রে এখুনি সেখানে চ'লে যাও, ওষুধ পাবে।

আচ্ছা বাবুজি—ব'লে লছমী পুঁটলীটি নিয়ে নামলো।

তারপর অনেক কষ্টে সমীরকে ষ্টেশনের বাইরে এনে গরুর গাড়ীতে তুলে লছমী তা'র পাশে ব'সে হাসিমুখে বললে, অনেক কষ্টে বেঁচে গেছি বাবা,—এই গাড়োয়ান, চলো—

সমীর বললে, হেসে ফেললেই কিন্তু ধরা প'ড়ে যেতুম, লছমী!
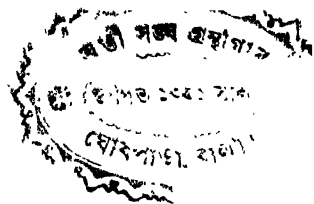
এগার

সেই যে লছমী আর সমীর গরুর গাড়ীতে চ'ড়ে অজানা গ্রামের পথ ধ'রে নিরুদ্দেশে যাত্রা করলো, তারপরে বছর দেড়েক তাদের আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশের গুপ্ত রিপোর্টে এইটুকু শুধু জানা গেছে তারা এ তল্লাটে নেই, এবং তারা এক জেলা থেকে অন্য জেলায়, এক দেশ থেকে অন্য দেশে এমন ভাবে গা ঢাকা দিয়ে ভ্রমণ করছে যে, তাদের খুঁজে বা'র করা অত্যন্ত কঠিন। কখনো তা'রা নদী-পথে, কখনো গ্রামে-প্রান্তরে, কখনো লোকের ভীড়ে, আবার কখনো বা বড় বড় শহরের বস্তির আনাচে কানাচে—এই ভাবে পালিয়ে দিন কাটাচ্ছে। একদিন হয়ত তা'রা বেকায়দায় প'ড়ে ধরা পড়তে পারে, কিন্তু আপাতত পুলিশ তাদের সম্বন্ধে অনেকটা নিরাশ হয়েছে—একথা মিথ্যে নয়।

এর মধ্যে বছর খানেক আগে কেবল একটি ছোট ঘটনা ঘটে।

লছমী আর সমীর পালাবার আগে লছমীর বাপ রতন সর্দ্দারকে সমীর ব'লে এসেছিল, কোনো ভয় নেই সর্দ্দার, আবার আমরা ফিরে আসবো।

কিন্তু সমীর আর ফিরে আসেনি। বরং হঠাৎ একদিন

দেখা গেল, রতন সর্দ্দার, তা'র বউ এবং ছোট একটি ছেলে—এদের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছেনা। আশপাশের কারুকে কিছু না জানিয়ে, সকলের চোখে ধূলো দিয়ে একদিন অন্ধকার রাত্রে তা'রা যে কোথায় চ'লে গেল, তা'র সন্ধান কেউ দিতে পারলো না।

খবরটা অবশ্য পুলিশের কানে যথাসময়ে উঠলো, একটা তদন্তও হোলো—কিন্তু রহস্যটা রহস্যই র'য়ে গেল। কেবল গ্রামের চৌকিদার সন্দেহ ক'রে বললে, বাইরের একখানা নৌকো এই গ্রামের ঘাটে কে যেন নোঙর করেছিল, রতন সর্দ্দার যাবার পর থেকে সেই নৌকা আর কেউ দেখেনি। ব্যাপারটা ওইখানেই চাপা প'ড়ে গেছে। এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায়নি।

কিন্তু ওদিকে যত রহস্যই থাকুক না কেন, এদিকের ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, সমস্তটাই সমীরের কীর্ত্তি। সেইটিই এখন বলা দরকার।

পুলিশের লোকেরা সমীরকে যখন অনুসরণ ক'রে চলেছে, সে তখন বহুদূরে একেবারে নাগালের বাইরে বললেই হয়। কিন্তু ছ'মাস ধ'রে তা'রা ভ্রমণ করেছে প্রচুর। ট্রেণে, নৌকায়, গাড়ীতে, পায়ে হেঁটে—তা'রা যে কত দেশ ঘুরেছে তা'র ইয়ত্তা নেই। টাকাকড়ি তা'দের কাছে যথেষ্টই ছিল, সেদিক থেকে তাদের কোনো কষ্ট হয়নি। খেয়েছে যা খুশি, থেকেছে যেখানে

সেখানে, কোথাও কোনো বাধা পায়নি। এমনি ক'রে মাস ছয়েকের পর তা'রা বহুদূর কোন্ একদেশে গিয়ে কি এক নদীর ধারের গ্রামে আশ্রয় নিল। সেই গ্রামের এক গয়লার অনুগ্রহে তাদের অনেক রকম সুবিধাও ঘটে গেল। সমীরের মনে আবার সৌভাগ্য সৃষ্টির দুরাশা জেগে উঠলো। সত্য বলতে কি, তা'র অধ্যবসায় ও পরিশ্রমশক্তি কখনো নিষ্ক্রিয় হয়ে ব'সে থাকতে পারতো না। দুরাশা এবং দুঃসাধ্য স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে ভবিষ্যতের কাজের কথা ভাবতে লাগলো।

এইরকম একটা অবস্থায় একদা সে তা'র একজন অনুচরকে পাঠালো রতন সর্দ্দারের খোঁজে।

সেইদিন থেকে সমীর আবার নিজের কাজে মন দিল। কিছুকাল থেকে আবার একটা নতুন কাজের কথা সে ভাবছিল। ইদানীং টাকাকড়ির যথেষ্ট স্বাচ্ছল্য তার ছিল। পালিয়ে আসবার আগে সে অনেক ভেবে চিন্তে অনেক টাকা সঙ্গে এনেছে, সুতরাং নতুন একটা কিছু কাজ আরম্ভ করতে তা'র বাধা নেই। তা'র কাছে একটা পিস্তল আজো রয়েছে, কিন্তু সেটাকে রাখতে হোলো লুকিয়ে।

নদীর ধারে ছোট গ্রামে তা'রা পাতার ঘর বাঁধলো। এ পাশে রবিশস্যের ক্ষেত—সেখানে কলাই, সর্ষে, আলু, ইত্যাদি উঠছে। ওপাশ দিয়ে জেলাবোর্ডের রাস্তার গা ঘেঁসে পথ চ'লে গেছে ভালুকডাঙ্গার জঙ্গলে। অনেকে বলে, ওই জঙ্গল পেরিয়ে

গেলে পাওয়া যায় রতনগিরি, ওর সীমানা নাকি মধ্যপ্রদেশের গায়ে। শীতকালে হাঁসের পাল আসে এই নদীতে। এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর।

গ্রামে লোক কম,—অনেক দূরে শনি-মঙ্গলের দিনে একটা ছোটখাটো হাট বসে। তা'র নাম ছত্রপতির হাট। কবে যেন রাজা শিবাজী এই পথ দিয়ে যাবার সময় ওখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সেই থেকে তাঁর নামেই হয়েছে হাটের নাম। সমীর বার কয়েক সেখান থেকে ঘুরে এসেছে।

যাই হোক, মাস দুয়েকের মধ্যে এ অঞ্চলের অনেক লোকের সঙ্গে সে আলাপ জমিয়ে নিল। নিজের নামধাম কোথাও সে প্রকাশ করেনি। আগেই বলেছি, সমীরের গায়ের রংটা হয়েছে রোদপোড়া, ছোট কাপড় সে পরে, ছাতু খায়, হিন্দি বলে চমৎকার, লেখাপড়া জানার ইঙ্গিতও কোথাও প্রকাশ করেনা—এবং গ্রাম্য চাষাদলের মধ্যে সে মিশে যায় অবাধে। সে নিজেও প্রায় ভুলতে বসেছে' সে বাঙ্গালী এবং পেনিটির বিখ্যাত গোঁসাই বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

গ্রামের লোকেদের সাহায্যে সে একখানা নৌকা বানালো। নৌকা চালনার কাজে লাগিয়ে দিল রতন সর্দ্দারকে। ছত্রপতির হাটের দিনে রতন সর্দ্দার নৌকা নিয়ে যায়, নদীর এপার থেকে ওপারে যাত্রীদের পার ক'রে বেশ দু পয়সা রোজগার করে। বিদেশে এসে রতনের একটা চমৎকার কাজ জুটে গেল।

রতন তা'কে বড় দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিয়েছিল, সেকথা সমীর কোনোদিন ভোলেনি।

নতুন দেশে এসে বেশ নিরিবিলি জায়গা পেয়ে সে অবারিত স্বাধীনতার মাঝখানে দিন কাটাতে লাগলো। মনে কেবল ভয় ছিল, যদি আবার পুলিশে তা'র গন্ধ পায়। অন্যায় সে কোথাও কিছু করেনি, অথচ পুলিশ তা'র পিছনে, এই অদ্ভুত কথাটা সে মাঝেমাঝে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতো। কিন্তু উপায় কিছু নেই। এ তাকে সহ্য করতেই হবে। এক একবার মনে করতো, সে ধরা দেবে। কিন্তু সে যে সুবিচার পাবে, একথা তা'র মনেই হোতো না।

বার

লছমীর অত ভয় ডর নেই। সে একরকম পুলিশের ভয় ভাবনা ভুলেই গেছে। ঘরে বসে তা'রা মায়ে-ঝিয়ে কড়াই ভাজে, যাঁতা পেষে, সূতো কাটে, চিঁড়ে কোটে। তা'র কাজ অনেক। চালার পাশে সে বসিয়েছে আম আর পেঁপের গাছ, লেবুর চারা লাগিয়েছে। এ ছাড়া ফুলের বাগানের ওপর তা'র ভারি ঝোঁক। ছত্রপতির হাটে গিয়ে সে সেদিন এক জোড়া রাজহাঁস আর চন্দনা কিনে এনেছে।

সমীর একটা মতলব নিয়ে কিছুদিন থেকে ঘুরছিল। গ্রামের কয়েকজন লোককে নিয়ে সে গিয়েছিল ভালুকডাঙ্গার জঙ্গলে। সেখানে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে ফিরেছে। সম্প্রতি কয়েকদিন যাবৎ তা'রা কয়েকজন নিয়মিত জঙ্গলে যায় কাঠ কাটতে। একদিন জানা গেল, সমীর কাঠ চালানির কাজ আরম্ভ করেছে। জমিদারকে নানাকথায় বুঝিয়ে সে একটা জমির ইজারা দখল নিয়েছে। গ্রামের লোকেরা তখনই একটু আশ্চর্য্য হয়েছিল বৈ কি। সমীরের হাতে এত টাকা এলো কোথা থেকে? জমিদারকে অত টাকা সেলামী আর খাজনাই বা সে জোগালো কেমন ক'রে? গ্রামে একটা কানাকানি প'ড়ে গেল।

ভালুকডাঙ্গার জঙ্গলের খ্যাতি চারিদিকে কম নয়। আগে এদিকে অতিশয় বাঘের উপদ্রব ছিল, আজকাল অতটা ভয় অবশ্য নেই। তবু মধ্যে মধ্যে ছাগলটা, বাছুরটা এখনও চুরি যায়। কিন্তু এ নিয়ে লোকে তেমন আর মাথা ঘামায় না।

সম্প্রতি এখান থেকে মাইল দশেক দূরে নাকি একটা নরখাদক বাঘের আনাগোনা বেড়েছে শোনা যাচ্ছে। দূরের গ্রামের এক ভীল পরিবারের একটি ছোট মেয়েকে সেদিন বাঘটা তুলে নিয়ে পালিয়েছে, এবং এইরূপ নাকি আরো দু'একটা ঘটনা ঘটে গেছে। লোকেরা গিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে প্রার্থনা জানায়, এর প্রতিকার করতেই হবে। কয়েকদিন বাদে বাঘের উৎপাত যখন সত্যই বেড়ে চললো, তখন লছমনগড়ের বড় সাহেব সরকারীভাবে ঘোষণা করলেন, বাঘটাকে যে মারতে পারবে সে পাবে একশত টাকা পুরস্কার।

খবরটা শুনে সমীরের রক্ত নেচে উঠলো। পুরস্কারের লোভ তা'র কিছুমাত্র নেই, কিন্তু শিকারের নেশায় সে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কিন্তু তা'র আত্মপ্রকাশ করার উপায় নেই। চুপ ক'রে থাকতে সে বাধ্য। লছমী তা'র মনের কথাটা বুঝলো, সেইজন্য সেও আর কিছু বললে না। বাস্তবিক, লুকিয়ে থাকার যন্ত্রণা যেন আর তাদের সহ্য হয় না!

কিন্তু ভাগ্য তা'র প্রতি একটু প্রসন্ন বলতেই হবে। দিন সাতেক পরে ইউনিয়ন থেকে এবং উখ্ড়া থানা থেকে

খবর এলো, লছমনগড়ের ছোট হাকিম দলবল সঙ্গে নিয়ে শিকারে এসেছেন। তাঁর ইচ্ছা, তিনি নরখাদক বাঘটিকে মেরে পুরস্কারটি গ্রহণ করবেন। তাঁরা জানতে পেরেছেন, বাঘটা ভালুকডাঙ্গার জঙ্গলে এসে ঢুকেছে।

ছোট হাকিম বেশ অভিজ্ঞ শিকারী বোঝা গেল। তিনি জঙ্গলের ভিতরে একটা বিশেষ জায়গায় নালার ধারে মাচা বাঁধতে হুকুম দিয়েছেন। বাঘের অস্তিত্ব জানবার জন্য তিনি ইতিমধ্যেই একটা ছাগল বেঁধে আসার আদেশ দিয়েছিলেন, এবং সত্যি সত্যিই বাঘ এসে ছাগল মেরে নিয়ে গেছে। এই খবরে সকলেই এখন সন্ত্রস্ত।

থানা থেকে লোক এলো এই গ্রামে। সমীর এখানকার দলপতি, সুতরাং চৌকিদার এসে তা'র কাছে জানালো, অন্তত জন পঞ্চাশেক লোককে গিয়ে সাহেবের শিকারের সুবিধার জন্য 'ঝালোয়া' বাজাতে হবে। ঢাকের শব্দে বাঘ বেরোলে ছোট হাকিম মাচার উপর থেকে বাঘ মারবেন। সমীরকে অবশ্য রাজী হতেই হোলো।

সেটা রবিবার। হাকিম তাঁর দলবল নিয়ে তিনখানা মোটর সমেত জঙ্গলে ঢুকলেন। সমীর লক্ষ্য ক'রে দেখলো, সবসুদ্ধ পাঁচ ছয়টা রাইফেল আর বন্দুক। তার হাতখানা যেন নিসপিস করতে লাগলো। কিন্তু লোভ করবার কোনো উপায় নেই। সে বেশ নিরীহভাবে তা'র লোকজন নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে

ঢুকলো। কোনো কোনো জায়গায় বাঘের পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা গেল।

কিন্তু আয়োজন বড় হলেই যে ফলাফলটা সব সময়ে বড় হয়না, সেদিন সেকথাটা বোঝা গেল। সবসুদ্ধ একশত লোক মিলে ঢাক আর কাঁসি বাজালো, সেই আওয়াজে প্রকাণ্ড বাঘ এলো বেরিয়ে—কিন্তু সেই জানোয়ার সহসা একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে একটা গর্জ্জন করলো, এবং পরমুহূর্ত্তে কয়েকটা ঝালোয়াদারকে আক্রমণ করলো। দুইবার রাইফেল ছোড়া হোলো, এবং একবার বন্দুক। বাঘের ল্যাজটা সামান্য জখম হোলো বটে, কিন্তু তা'র পালাবার পরে দেখা গেল, দুইটা লোককে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিয়ে গেছে।

সমীর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। হাকিম মাচা থেকে নেমে এলে সে উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, সাহেব, বাঘ শিকারের এই পদ্ধতি নয়। রাইফেল ওইভাবে ব্যবহার করা ভুল। আপনাদের অভ্যাস নেই মনে হচ্ছে।

আহত লোক দুটোর চিকিৎসার জন্য তখনই ব্যবস্থা ক'রে তাদের সরানো হোলো। কিন্তু সমীরের কথা শুনে এবং তা'র চোখ মুখের চেহারা দেখে হাকিম এগিয়ে এসে বললেন, কে হে ছোকরা তুমি?

সমীর বললে, আমি চাষী।

এত স্পর্দ্ধা কেন তোমার?

সমীর এবার একটু ভয় পেলে। বললে, হুজুর মাপ করুন, কথাটা উত্তেজনায় ব'লে ফেলেছি। কিন্তু হুজুর, বাঘটা পালায়নি।

পালায়নি ? তুমি কি কানা ? সবার সামনে দিয়ে দৌড়ে পালালো, আর তুমি বলো পালায়নি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কাছাকাছি আছে মনে হচ্ছে—বাঘটা আমি মেরে দেবো হুজুর ?

কি দিয়ে মারবে ? গাছের ডাল দিয়ে ?

না হুজুর, রাইফেল দিয়ে।

হাকিম তখনও বাঘের ভয়ে কাঁপছিলেন। কিন্তু চাষার মুখে রাইফেলের নাম শুনে তিনি সদলবলে হো হো ক'রে অট্ট-হাস্য ক'রে উঠলেন। তাঁদের হাসি দেখে সমীরের রক্তে যেন আগুন লাগছিল। কিন্তু হায়, তাকে চুপ ক'রে থাকতেই হবে। একথা সে জানাতে পারছে না, তার শিকার করা আর বন্দুক ছোড়ার খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে পৌঁছেছিল।

সাহেব তাঁর সঙ্গীদের ইংরেজী ভাষায় বললেন, চাষা কিনা, তাই টাকায় লোভ বেশী। বাঘ মেরে যদি টাকাটা পেয়ে যায়, ছোকরার এইটিই লোভ।

সমীর তৎক্ষণাৎ তা'র উত্তর দিল। বললে, হুজুর, মাপ করবেন, বাঘ মারলেও টাকা আমি নেবো না—টাকায় আমার লোভ নেই।

হাকিম একটু অবাক হোলেন। সমীর ইংরেজী কথা বুঝবে এটা তিনি ভাবতেই পারেন নি। তিনি বললেন, আমার রাইফেলের গুলী নষ্ট করতে চাও, এই ত ?

গুলী নষ্ট হবে না, হুজুর। আমি কথা দিচ্ছি।

হাকিম তখন কিছু আকৃষ্ট হলেন। বললেন, এক্ষুনি মেরে আনতে পারো ?

সমীর বললে, আজ্ঞে না। হয় আজ শেষ রাত্রে, নয়ত কাল ছুপুরে ওকে খুঁজে বা'র করতে পারি। আপনিও সঙ্গে থাকতে পারবেন, হুজুর।

হাকিম তার আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য ক'রে তা'র মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, আমি রাজী। কাল ছুপুরে।

সমীর খুশী হয়ে সেদিন তা'র লোকজন নিয়ে ফিরে গেল।

পরদিন ছুপুরে সাহেব কেবলমাত্র ছু'জন লোক, আর গোটা ছুই রাইফেল নিয়ে এসে হাজির। সমীর প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, কিন্তু তা'র সঙ্গে ছিল লছমী। লছমী তার সঙ্গ ছাড়েনি। সবাই মিলে মোটরে উঠে সেদিন যাত্রা করলো। হাকিম বললেন, ওহে, মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে যাচ্ছ, তোমার সাহস কম নয় ত ? ওকে বাঁচাবে কে ?

সমীর বললে, ও নিজেই বাঁচতে জানে, হুজুর। জঙ্গল

দেখে এদেশের মেয়ে ভয় পায় না। কোনো ভাবনা নেই, আপনি চলুন।

প্রায় ছয় মাইল পথ। এ অঞ্চল এরই মধ্যে সমীরের চেনা হয়ে গেছে। জঙ্গল ঘুরে রাস্তা ঘাট হিসেব করে সে এক জংলী পল্লীর ধারে এসে গাড়ী থামাতে বললে। গাড়ী থেকে নেমে এসে সে একজন জংলীকে খুঁজে বার করলে। তাকে কি যেন ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে। তারপর হাসিমুখে ফিরে এসে বললে, নামুন হুজুর, বাঘ কাছাকাছি আছে। কিন্তু আমাদের খুব চুপি চুপি যেতে হবে। দিনের বেলা ওরা বাইরের দিকে আসে না।

লছমী বললে, আমি সঙ্গে যাবো।

হাকীম রাজী হলেন না। কিন্তু সমীর বললে, যেতে চায় চলুক হুজুর, কোনো ভয় নেই।

হাকিম ভয়ে বিস্ময়ে বিরক্তিতে চুপ ক'রে রইলেন। তিন জনে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো। পথ কম নয়, প্রায় মাইল দেড়েক তাদের হাঁটতে হোলো। বাস্তবিক, সমীরের যেন সবই মুখস্থ, সবই তার হিসেবের মধ্যে। হাকিম তাঁর একটা রাইফেল সমীরের হাতে দিলেন। তা'তে পাঁচটা বুলেট্ ভরা ছিল।

কিছুদূরে গিয়ে সহসা সমীর থমকে দাঁড়ালো। তারপর আঙ্গুল দেখিয়ে ইঙ্গিতে জানালো, শীঘ্র আমাদের গাছে উঠতে হবে, হুজুর।

তারপর পলক মাত্র। কাছেই একটা গাছের ডালে বন্দুকটা ঝুলিয়ে সমীর আগে গাছে চড়লো, তারপর একে একে হাকিম ও লছমীকে তুলে নিল। সমস্তটাই তার পক্ষে সহজ। হাকিম ও লছমীকে সে নিরাপদ একটা ডালে চড়িয়ে রাইফেলটা হাতে নিয়ে সে নিঃসাড়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা ক'রে রইলো।

কয়েক মিনিটের অধীর উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা। তারপর, আশ্চর্য্য অদ্ভুত ভাবে, দূরের ঝোপজঙ্গলে ঝরা পাতার মসমস শব্দ, তার সঙ্গে ল্যাজের ঝাপট, এবং তারপর দেখতে দেখতে বিরাট ব্যাঘ্রমূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করলো।

তারা পিছন দিকে ছিল, সুতরাং বাঘ তাদের প্রথমে লক্ষ্য করেনি। কিছু দূরে ঝোপের পাশ দিয়ে সে যখন কয়েক গজ মাত্র এগিয়ে গেছে, সেই মুহূর্ত্তে হাকিম কম্পিত দৃষ্টি তুলে দেখলেন, এ যেন সমীর নয়, আর কেউ। আরক্ত হিংসা আর নির্ভীক বলিষ্ঠতায় সমীরের মুখখানা তখন টকটক করছে। কিন্তু সে একটি পলকমাত্র। পরমুহূর্ত্তে সমীর রাইফেলটা হাতে নিয়ে গাছ থেকে ঝপাং ক'রে নীচে লাফিয়ে পড়লো।

বাঘ চমকে উঠে তাকালো ফিরে। সমীর রাইফেলটা বাগিয়ে কয়েক পা তা'র দিকে এগিয়ে গেল। ছোকরার নিশ্চিন্ত মৃত্যু জেনে হাকিম চীৎকার করতে গেলেন, কিন্তু তাঁর গলায় স্বর ফুটলো না। বাঘটা তার দিকে তাকিয়ে মুখ-ব্যাদান ক'রে গর্জ্জন ক'রে উঠলো। সমীর রাইফেল তুলে লক্ষ্য স্থির করলো।

এরপর সমস্তটাই যেন ছবির মতন। হিংস্র নরখাদক বাঘ সেইখান থেকে পর্ব্বতপ্রমাণ লাফ দিয়ে তা'কে আক্রমণ করলো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাইফেলের আওয়াজ হোলো—গুড়ুম! গুলীটা লাগলো ঠিক গলার নীচে। বাঘ পড়লো ছিটকে আর্ত্তনাদ ক'রে। তারপর দ্বিতীয় গুলীর আওয়াজ, সেটি লাগলো বাঘের মাথায়।

একটা গাছের গুঁড়ি ধারালো দাঁতে চিবিয়ে গোঁ গোঁ ক'রে সেই বিশাল হিংস্র জানোয়ার ঘুরপাক খেতে লাগলো। কিন্তু তখন তৃতীয়বার আওয়াজ ক'রে রাইফেলের আর একটা গুলী তা'র কাঁধের অস্থি বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে গেল। বাঘের মৃত্যু তখন আসন্ন।

অপূর্ব্ব বীরত্ব এবং আশ্চর্য্য শিকার-কৌশল। লছমীর পিছনে পিছনে হাকিম গাছ থেকে নেমে এসে সমীরের হাত ধ'রে আনন্দে ঝাকানি দিতে লাগলেন। একজন সামান্য চাষার ছেলের এত বড় বুকের পাটা, না দেখলে বাস্তবিকই বিশ্বাস করা কঠিন।

সেদিন মরা বাঘ সেখানে প'ড়ে রইলো। হাকিম ওদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দে হাসিতে গর্ব্বে সারা জঙ্গল মুখর ক'রে এক সময় বেরিয়ে এলেন।

জঙ্গলের সীমানার পথের কাছে তাঁর গাড়ী এবং সঙ্গীরা অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ফিরে এসে দেখা গেল সেখানে আরো

তিন চারখানা মোটর, এবং জন পঁচিশেক পুলিশের লোক অপেক্ষায় রয়েছে। সমীর এবং লছমী বেরিয়ে আসতেই একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে গম্ভীর মুখে সমীরের হাতে হাত কড়া লাগালেন। লছমীর দুই পাশে এসে দাঁড়ালো দুজন সেপাই।

হাকিম বিস্ময়ে অভিভূত। সমীর আর লছমী একেবারে স্তব্ধ।

পুলিশ অফিসার একখানা কাগজ বার ক'রে হাকিমকে দেখালেন। হাকিম চমকে উঠলেন।

দুজনকে একসঙ্গে গ্রেপ্তার করা হোলো। সমীর বলেছিল, শিকারের পুরস্কার সে নেবে না, কিন্তু পুরস্কার আপনা হতেই জুটে গেল বৈ কি!

এবার ফাঁসী, কিম্বা দ্বীপান্তর!

অবশেষে সমীর আর লছমী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হোলো।

দুজনকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশ দীর্ঘকাল ধ'রে হয়রাণ হয়েছে; আজ ওদের একসঙ্গে পেয়ে হিংস্র উল্লাস পুলিশ অফিসারের চোখে জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। ওদের জন্য রঘুনন্দনপ্রসাদের জমিদারীতে হাঙ্গামা, ওদের জন্য গ্রামে

আগুন লাগা, ওদের জন্য সেপাইরা আহত এবং ওদের ধরতে গিয়েই একটা লোক গুলীর আঘাতে হাত ভেঙ্গেছে। নদীর পারে তিনচার জন লোক খুন হয়েছে ওদেরই হাঙ্গামার ফলে, সেই তদন্ত আজও চলছে। এত বড় অপরাধী দুটি ছেলেমেয়ে ভূ-ভারতে আর কোথাও নেই। গ্রেপ্তার হবার পর সমীর নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলো, এযাত্রা ফাঁসী যদি বা বেঁচে যায়, দ্বীপান্তরে তা'কে যেতেই হবে। লছমী ভাবতে লাগলো, কয়েদখানাতে মেয়ে-অপরাধী হিসাবে তার বাকী জীবন কাটবে।

কিন্তু সমীরের বাঘ শিকারের অদ্ভুত বীরত্ব দেখে হাকিম মুগ্ধ হয়েছিলেন। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা মাত্রই সমীর যে পুলিশের হাতে এমন ভাবে ধরা পড়বে, এ তিনি কল্পনা করেন নি। তার অপরাধ যত বড়ই হোক, সে একজন বীর কর্ম্মী, তা'র খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এ তল্লাটে কম নয়। হাকিম একটু সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠলেন।

পুলিশ অফিসার সমীর আর লছমীকে হাতকড়া সমেত নিজেদের গাড়ীতে তুলে দলবল সঙ্গে নিয়ে চ'লে গেলেন।

সমীর একজন মস্ত বনেদী ঘরের ছেলে একথা সে নিজেও ভুলতে বসেছিল। কিন্তু মামলা হবার পর তা'র পরিচয় সকলে জানতে পারলো। সে তার ঘরবাড়ী, মা বাপ, সকলকে ছেড়ে কয়েক বছর আগে পালিয়েছিল কেমন একটা দুরাশার ডাকে। দেশবিদেশে, পথে, প্রান্তরে, পাহাড়ে-নদীতে, দুর্গম

জঙ্গলে সে অসীম সাহসের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। সে নাকি একজন দাতা, কর্ম্মী, শিকারী এবং সে ছিল হাজার হাজার লোকের অভিভাবক। কত লোক নাকি তাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু কোনপ্রকারেই তার মৃত্যু ঘটে নি। যেখানেই সে গেছে, সে-গ্রাম সে তৈরী করেছে, মানুষ তৈরী করেছে। তার জন্য আজও বহু লোক পেটের অন্ন ক'রে খাচ্ছে।

তা'র ও লছমীর বিপক্ষে মামলাটা অনেক বড়। দুজন হাকিম এই মামলার সাক্ষী। এর সঙ্গে জমিদার রঘুনন্দনপ্রসাদ, একজন মিল-মালিক, দুজন ডাকাত সর্দ্দার, কয়েকজন জংলী ও চাষী, রতন সর্দ্দারের দল, পাঁড়ে ও চৌবে, জন চারেক নৌকার মাঝি, তিনজন পুলিশ অফিসার, কয়েকজন শিকারী, এবং আরো অনেকে। মামলাটা অত্যন্ত জটিল, এবং চলবে অনেক দিন। এই জেলার যিনি প্রধানতম পুলিশ অফিসার, এই মামলার সর্ব্ব-প্রকার পরিচালনা এবং দায়িত্বভার একমাত্র তাঁর হাতে। তিনি যে ভাবে এই মামলা সাজিয়ে ধরবেন, সেই ভাবেই হাকিমের বিচার হবে।

গ্রেপ্তার ও সাক্ষ্যদের সমন ধরাবার হিড়িক পড়ে গেল। রঘুনন্দন তাঁর দলবল নিয়ে এসে পড়লেন। সকল সাক্ষীরাই একে একে এসে হাজির হলেন।

রঘুনন্দনপ্রসাদ যখন এসে শুনলো যে, তা'র দলবলের

সঙ্গে একদিন যে সকল চাষার দাঙ্গা বেধেছিল তারা ধরা পড়েছে, সে নিজেও দুশ্চিন্তায় পড়লো। একথা সে ভোলেনি, তারই লোক আগুন দিয়ে আগে মারপিট করেছে। হঠাৎ একথাও তা'র কানে গেল, এই মামলায় সমীর নাকি প্রধান আসামী। সমীর যে আজো বেঁচে আছে, এই আনন্দে রঘুনন্দন দিশাহারা হয়ে গেল। সে স্থির করলো, যেমন ক'রেই হোক, খুনোখুনির ব্যাপারটা সে চেপে যাবে এবং সমীরের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তা'রা আনবে না। আর যাই হোক, একদিন সমীরকে সে পুত্রের সমান পালন করেছিল। এ মামলাকে যেমন ক'রেই হোক, ফাঁসিয়ে দিতে হবে।

এর পরে নৌকায় যে লোকটা সমীরের পিস্তলের গুলীতে আহত হয়েছিল, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার কাছ থেকে পুলিশ এজাহার নেবার আগেই সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে, আর তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তার স্বপক্ষে দুজন সেপাই ছাড়া আর কোনো সাক্ষীই নেই। কিন্তু সমর্থক না পাওয়া গেলে পুলিশের সাক্ষ্যে বিশেষ কোনো কাজ হবে না। সুতরাং সমীরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ পিস্তল ছোড়ার অভিযোগটার আর কোনো তদন্ত হবার উপায় নেই। তা ছাড়া থানাতল্লাসীর সময়ে সমীরের ঘরে কোনো পিস্তলও পাওয়া যায়নি। সমীর সেই অস্ত্রটি আগেই একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গায় মাটির তলায় পুতে রেখেছিল। পুলিশের বড় সাহেব তা'র কোনো হদিস পেলেন

না। তাঁর মনে হোলো, এই ছোকরা অপরাধী নানাপ্রকার অভিযোগের ফাঁস আলগা ক'রে রেখেছে।

কিন্তু এরপরে একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটলো। পুলিশের যিনি বড় সাহেব, তিনি সেদিন ব্যক্তিগতভাবে আসামীকে জেরা করার জন্য সদরের কয়েদখানায় এসে হাজির হলেন। সেপাইরা বাইরে রইলো, এবং তিনি এসে কয়েদখানায় আসামীর হাজতের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন।

আসামীর সঙ্গে বড় সাহেবের চোখাচোখি হোলো। সমীর একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময়ে সবিস্ময়ে হাসতে হাসতে বললে, আপনি ?

পুলিশ সাহেব আসামীর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁর হিংস্র দুইটা চোখ যেন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো।—কে তুমি ? চেনো আমাকে ?

অধীর উল্লাস চেপে রেখে সমীর বললে, আপনাকে খুঁজে বার করবার জন্যে ত আমি একদিন ঘর ছেড়েছিলুম। আমাকে চিনতে পারছেন না ?

তিনি বললেন, কই, না ?

আপনি মেজর সিং ত ? আপনি যে আমার পিসেমশাই ! মনে পড়ছে না ? আমি সেই সমীর !

সস্নেহ হাসিতে মেজর সিংয়ের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বললেন, কী আশ্চর্য্য ! তোমাকে চিনতে পারিনি, বাবা। এত বদলে গেছ ?

সমীর তাঁর পায়ের ধূলো নিল। তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন।

সেই কয়েদখানার মধ্যে এমন আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটবে, একথা কেউ কল্পনাও করেনি। মেজর সিং অতঃপর সমীরের আনুপূর্ব্বিক কাহিনী শুনতে চাইলেন। সমীর তার এই অল্প জীবনের দুঃসাহসিক ঘটনাবলী একে একে সমস্ত ব'লে যেতে লাগলো। কোথাও এতটুকু গোপন করলো না। মেজর সিং সস্নেহ হাসিমুখে স্তব্ধভাবে ব'সে এই বীর বালকের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক শুনে যেতে লাগলেন। এক সময়ে হেসে বললেন, দুষ্টু ছেলে, আমিও যে তিন বছর হোলো তোমাকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করছি ! কিন্তু খবরদার, তুমি যে আমার আত্মীয় একথা কেউ যেন জানতে না পারে। মনে রেখো।

মামলার চেহারাটা বিরাট বিবরণে দেখা দিল। পুলিশ সাহেব অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ক'রে ঘটনাগুলি এমন ভাবে সাজালেন যাতে জানা গেল, সমীর কোনো অপরাধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে নেই। কেবল তাই নয়, সমীরকে যারা হত্যার ষড়যন্ত্র ক'রে চুরি ক'রে ইঁদারার ভিতর বন্দী ক'রে রেখেছিল, তাদের কথাও সব জানা গেল। অর্থাৎ মামলাটা ঘুরে গিয়ে অনেকটা এই প্রকার দাঁড়ালো যে, একজন দুঃসাহসিক

দেশপ্রেমিক যুবক জনসাধারণের কাজ করতে নেমেছিল, তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে জমিদার ও কয়েকজন ডাকাত তা'কে হত্যা করার চক্রান্ত ক'রে বেড়িয়েছে। বালক তার নিজের প্রাণরক্ষার জন্য নানাপ্রকার বুদ্ধির খেলা দেখিয়েছে। লছমী ও রতন সর্দ্দার তা'র সহচর ছিল মাত্র, তারা মোটেই অপরাধী নয়।

আগেই বলেছি হাকিম সমীরের শিকার কৌশল ও বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখন তাঁর বিচারে সমীর, লছমী, রতন ও অন্যান্যরা সসম্মানে মুক্তি পেল। আদালতের সমস্ত সমবেত লোক এই তরুণ যুবকের অসাধারণ প্রতিভা ও নিরাপরাধ কার্য্যাবলী লক্ষ্য ক'রে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। আদালতের ভীড় ঠেলে যখন সমীর এসে বাইরে দাঁড়ালো সেই সময় তার মা, মাসিমা, বাবা, বাড়ীর বুড়ো চাকর এবং ঠাকুরমারা সহসা কোথা থেকে দৌড়ে এসে তাকে কেঁদে জড়িয়ে ধরলেন। সে কী আনন্দের কান্না—সে কান্না থামতেই চায় না। সুদীর্ঘ কাল পরে সমীর আবার সকলকে ফিরে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো। লছমী ও তার বাবা, গ্রামের চাষারা এবং সমীরের দুর্দ্দিনের বন্ধুরা সকলের মুখে চোখে আজ হাসি খুশীর শেষ নেই।

আনন্দের একটা হট্টগোল প'ড়ে গেল।

হিসাব ক'রে দেখা গেল, সমীর একটা প্রকাণ্ড জমিদারী ও একটি মস্ত চিনির কলের পরিচালক। বহু টাকা তার ব্যাঙ্কে

আমানত করা। সে মস্ত সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু এ সমস্তই আজ তা'র পিছনে প'ড়ে রইলো। বিশ্বাসী লোকের হাতে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে গ্রামবাসীদের সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা ও সংস্থান ক'রে সমীর তা'র মা-বাবাদের সঙ্গে কলকাতায় ফিরবার আয়োজন করলো। লছমী ও তার বাপ রতন সর্দ্দারের হাতে জমিদারী পরিচালনার ভার রইলো। তা'রা বড়লোক হ'য়ে গেল।

প্রায় এক বছর কেটে গেছে। কিন্তু দেশে ফিরবার কিছুদিন পর থেকেই আবার সমীরের মনে ধরেছে অস্বস্তি। বাহির যেন তাকে ডাকছে, তা'র অতৃপ্ত দুরাশা তাকে দুর্গম দেশ থেকে যেন হাতছানি দিয়ে বলছে, আয়, আয়, আয়।

সমীরের কিছু ভাল লাগছে না। তা'র মনে তৃপ্তি নেই। আবার সে দুঃখ ও বিপদ বরণ করবে, দুঃসাহসিক অভিযানের দিকে ছুটবে, ভয় ও দুর্য্যোগকে জয় করবে।

কিন্তু সে কোন্ দেশ? কোন্ সাগরের পার? কোন্ পাহাড় আর বন আর মরুপথ পেরিয়ে? কিন্তু সেকথা কিছুই তার জানা নেই। একদিন অস্থির হয়ে সে আবার বেরিয়ে পড়লো। কোন্ সে এক দুর্গম দেশের পথে।—